কোর্স ম্যানুয়াল

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

কোর্স ম্যানুয়াল
গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা

প্রধান সম্পাদক
হাবিবুর রহমান খোন্দকার
প্রকল্প পরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ
মোঃ আবদুল খালেক
পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী
মোঃ শাহাজাহান
সহকারী পরিচালক
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
সহকারী পরিচালক

রচনা
পরিশিষ্ট-ক তে উল্লেখিত কর্মকর্তাগণ

প্রকাশ কাল
জুন ২০০৭

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও মুদ্রণ
মিম কনস্যালটেন্ট
৩৮০/বি মিরপুর রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ
হাবিবুর রহমান খোন্দকার
প্রকল্প পরিচালক
স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের অবদান স্বাধীনতার পর থেকেই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সত্তর দশক থেকে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি শুরুর পর থেকে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিকৃত চিংড়ির মাঝে লবণাক্ত ও স্বাদু উভয় পানিতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি রপ্তানি হয়ে থাকে। রপ্তানিকৃত চিংড়ির মাঝে চাষ ক্ষেত্রে উৎপাদিত চিংড়ির অবদান প্রায় ৮৫% এবং বাকী ১৫% চিংড়ি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে আহরিত হয়ে থাকে। চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সাথে চিংড়ির উৎপাদন এলাকা অর্থাৎ চাষ এলাকাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ১৭০ হাজার হেক্টর জমিতে লবণ পানির চিংড়ি এবং প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে স্বাদু পানির গলদা চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে। স্বাদু পানিতে বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি উৎপাদিত হলেও চাষ ক্ষেত্রে মূলত গলদা চিংড়ির (*Macrobrachium rosenbergii*) চাষ হয়ে থাকে। দেশে গলদা চিংড়ি চাষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যেও এর অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিকৃত চিংড়ির মাঝে গলদা চিংড়ির অবদান প্রায় ২৩% এবং প্রতি বছর তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে গলদা চিংড়ির চাষ এলাকা বৃদ্ধি পেলেও হেক্টর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না দেশে বর্তমানে হেক্টর প্রতি ৪০০-৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয় যা গলদা চিংড়ি উৎপাদনকারী অন্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। উৎপাদন কম হবার প্রধান অন্তরায়সমূহ হিসাবে নিচের সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে -

- পোনার স্বল্পতা ও অধিকমূল্য
- চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে কারিগরি আধুনিক জ্ঞানের অভাব
- মানসম্মত গলদা চিংড়ির খাদ্যের অভাব, খাদ্যের মূল্য আধিক্য
- প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর স্বল্পতা
- রেণু পি,এল উৎপাদনে কারিগরি জ্ঞানের সম্প্রসারণ না ঘটা এবং টেকনেশিয়ান এর স্বল্পতা
- খামারিতে প্রতিপালিত ব্রুডস্টকের অভাব
- পুঁজির স্বল্পতা
- বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগের অপ্রতুলতা
- অভিজ্ঞ জনবলের অভাব

গলদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গলদা উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও চিংড়ি উৎপাদনকারীদের দক্ষতা ও উন্নয়নের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। চাষিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান ম্যানুয়াল "গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা" রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ম্যানুয়াল মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছেন যা অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত। ম্যানুয়ালের পরিশিষ্ট-ক তে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করা যায় যে, এ ম্যানুয়ালে প্রণীত বিষয়ের আলোকে মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও সম্প্রসারণ কর্মীগণ উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হবেন, যা গলদা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে। এ ম্যানুয়াল মুদ্রণে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করেছেন এ জন্য "স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প" সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। দেশের গলদা চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে এ ম্যানুয়াল অবদান রাখতে পারলে এ প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে বলে আশা করা যায়।

হাবিবুর রহমান খোন্দকার
প্রকল্প পরিচালক
স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সূচি

১.	কোর্সের ভূমিকা, গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা	০৬
২.	গলদা চিংড়ির জীববিজ্ঞান ও চাষ পদ্ধতির প্রকার	১০
৩.	গলদা চিংড়ি উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ, মাটি ও পানির গুণাগুণ	১৬
৪.	পাড় মেরামত, দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ, জলজ আগাছা পরিস্কার করণ, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন এবং পুকুর পাড়ে বেষ্টনী নির্মাণ	২০
৫.	চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ ও পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা	২৫
৬.	আশ্রয়স্থল স্থাপন, প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ, ভাল মানের জুভেনাইল সনাক্তকরণ	২৯
৭.	পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ, খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তি	৩৫
৮.	পানি ও সম্পৃরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৩৮
৯.	প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণ, সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার এবং নমুনায়ন	৪৪
১০.	গলদা চিংড়ির সাধারণ রোগ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার	৪৮
১১.	আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা, গ্রেডিং ও বিপণন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ	৫২
১২.	গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস ও চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ণ	৬১
১৩.	পরিশিষ্ট-ক	৭৭
১৪.	পরিশিষ্ট-খ	৭৯

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
মেয়াদকাল-৪ দিন

সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ

প্রশিক্ষণার্থীদের গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন করা হবে যাতে তাঁরা উৎপাদন পুকুর/ ঘেরে গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য ঃ

কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- গলদা চিংড়ির বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জীবন চক্র ও চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- গলদা চাষোপযোগী পুকুর ও ঘেরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলোর তালিকা তৈরি করতে পারবেন
- একক ও মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে মাছ ও চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব ও মজুদহার বলতে পারবেন
- সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব, খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন
- চিংড়ি চাষে উদ্ভুত সাধারণ সমস্যা ও উহাদের প্রতিকার ব্যবস্থা এবং নমুনায়ণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- চিংড়ির সাধারণ রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- চিংড়ি আহরণ ও বিপণন ব্যবস্থা ও মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- চিংড়ি চাষের রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন
- গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাক্টিস সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাছ ও চিংড়ি চাষে হ্যাসাপ এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মাছ ও চিংড়ি চাষে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ১ **সময়ঃ ১০:৩০-১২:০০** **মেয়াদকালঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ কোর্সের ভূমিকা, গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব , সমস্যা ও সম্ভাবনা

লক্ষ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের গলদা চিংড়ি চাষের ভূমিকা ও গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা গলদা চিংড়ি উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং সঠিকভাবে গলদা চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-গলদা চিংড়ি চাষের ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
গলদা চিংড়ি চাষের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
	* স্বাগতম * বর্তমান জ্ঞান যাচাই * বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন * অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা * উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয় বস্তু			**৭৫মিনিট**
	* কোর্সের ভূমিকা * গলদা চিংড়ি চাষের ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা * গলদা চিংড়ি চাষের সমস্যা	প্রশ্নোত্তর ও ফ্লিপচার্ট ছোট দলীয় কাজ	
সার-সংক্ষেপ			**১০ মিনিট**
	* মূল বিষয় পুনরালোচনা * উদ্দেশ্য যাচাই * পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ * হ্যাণ্ডআউট বিতরণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।		

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, অনুশীলনী শীট, ফ্লিপচার্ট, ইত্যাদি।

কোর্সের ভূমিকা, গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা

গলদা চিংড়ি চাষের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে স্বাদু পানিতে যে সকল প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় তার মধ্যে গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। এ ছাড়া খাদ্য হিসেবে গলদার গুণগতমানও খুবই বেশি। বাংলাদেশে প্রায় ২৭ প্রজাতির স্বাদু পানির চিংড়ি পাওয়া যায় যার মধ্যে গলদার আকার-আকৃতি সর্ববৃহৎ। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত গলদার ওজন সর্বোচ্চ ৪০০-৪৫০ গ্রাম এবং চাষ ক্ষেত্রে ২০০-২৫০ গ্রাম হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে গলদার পি,এল জুভেনাইল এবং পরিপক্ক গলদা সাধারণত: দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আধা লবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়। গলদা ছাড়া আরো কয়েকটি প্রজাতির চিংড়ি সারাদেশে পাওয়া যায় এবং এদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। গলদা চিংড়িকে কোন কোন অঞ্চলে শলা ইচা বা ছোয়া ইছা বলা হয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই এরা খালে, বিলে, প্লাবণভূমিতে বা প্লাবিত ধান ক্ষেতে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বড় হয়। কিন্তু পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে দেশের নদ-নদীতে তেমন আর গলদা বা গলদার পোনা পাওয়া যায় না।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের নিম্নাঞ্চল যেখানে প্রায় সারা বছরই পানি থাকে সেখানে গলদা চিংড়ির চাষ ভালভাবে করা যায়। বর্তমানে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে দেশের কমপক্ষে ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব। চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে দেশে গত ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। এ আয়ের পরিমাণ প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিকৃত চিংড়ির মধ্যে স্বাদু পানির চিংড়ির অবদান প্রায় ২৩% এবং এ পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে দেশে গলদা চিংড়ি উৎপাদন গড়ে হেক্টর প্রতি ৪০০-৫০০ কেজি যা অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। গলদা চিংড়ির উৎপাদন কম হবার কারণ নিম্নরূপঃ

- পোনার স্বল্পতা, পোনার অধিকমূল্য
- গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব
- মানসম্মত খাদ্যের অভাব, খাদ্যের মূল্য আধিক্য
- রেণু/ পি,এল উৎপাদনে কারিগরি জ্ঞানের সম্প্রসারণ না ঘটা
- নার্সারিতে প্রতিপালিত জুভেনাইলের অভাব
- পুঁজির স্বল্পতা
- বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সুযোগের স্বল্পতা
- প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবলের অভাব

গলদা চিংড়ি উৎপাদন ও সম্প্রসারণে বর্ণিত সমস্যাবলী সমাধান করা গেলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক গলদা চিংড়ির উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে । উপরন্তু দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি দারিদ্র দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এবং বর্ধিত জনগোষ্টির প্রাণিজ আমিষের অভাব পূরণ হবে।

সম্ভাবনা

গলদা চিংড়ির স্বাদু পানির চিংড়ি হওয়ায় এর চাষ বদ্ধ ও মুক্ত উভয় জলাশয়ে সম্ভব। সাধারণভাবে বলা যায় সব এলাকায় চিংড়ি চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিংড়ি খামারের আয়তন ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৪,০০০ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১৭০,০০০ হেক্টরের বেশী আয়তনে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদন।

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন উৎস থেকে গলদা চিংড়ির উৎপাদন (২০০৬)

উৎপাদন এলাকা	আয়তন (হেক্টর)	(হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি)	মোট উৎপাদান (মেঃ টন)
গলদা চিংড়ির একক চাষ	৫,০০০	৭৫০	৩,৭৫০
গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ (কার্প জাতিয় মাছের সাথে)	১২,০০০	৫০০	৬,০০০
ধান ক্ষেতে ধানের সাথে গলদার চাষ	২২,০০০	৩৭৫	৮,২৫০
ধান ক্ষেতে ধানের পরে গলদার চাষ	১১,০০০	৪৫০	৪,৯৫০
মোট চাষ ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন	৫০,০০০	৪৫৯	২২,৯৫০(মোট উৎপাদন ৮৭.৩%)
প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে উৎপাদন	নদী, খাল, বিল, প্লাবনভূমি ইত্যাদি		৩৩৩৫ (মোট উৎপাদন ১২.৭%)
বিভিন্ন উৎস থেকে মোট উৎপাদন			২৬,২৮৫

উৎস্যঃ মৎস্য অধিদপ্তর

সারণি ২ ঃ রপ্তানি বাণিজ্যে গলদা চিংড়ির অবদান

আর্থিক সন	মোট গলদা ও বাগদা রপ্তানি (টন)	গলদা চিংড়ির অবদান	
		পরিমাণ (টন)	মোট চিংড়ি রপ্তানির %
২০০১-২০০২	৩০,২০৯	৫,৪৩৭	১৮%
২০০২-২০০৩	৩৬,৮৬৪	৭,৩৭২	২০%
২০০৩-২০০৪	৪২,৯৪৩	৯,০১৮	২১%
২০০৪-২০০৫	৪৬,৫৩৩	১০,২৩৭	২২%
২০০৫-২০০৬	৪৮,০০০	১১,০৪০	২৩%

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর

উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায় , চিংড়ির শতকরা প্রায় ২৪% ভাগ উৎপাদন গলদা চিংড়ি থেকে পাওয়া যায়। গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধাগুলো হচ্ছে-

- চাষ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ
- গলদা চিংড়ি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়
- প্রায় সকল আকারই বাজারজাত উপযোগী। তবে ১২-৩০ গ্রেডের চিংড়ি উৎপাদনে লাভ বেশি।
- উচ্চ বাজার মূল্য, (প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে ৪৫০-৬৫০ টাকা/কেজি)
- স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ, ৬-৮ মাসে সম্পূর্ণ চিংড়ি বাজারজাত করা যায়
- অগভীর পুকুর/ঘেরে চাষাবাদ সম্ভব (১-১.৫ মিটার পানির গভীরতা)
- মৌসুমী পুকুরেও গলদার চাষ করা যায়
- গলদার সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ একত্রে করা যায়
- উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় সারা বছর পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- উপকূলীয় জেলাগুলোর স্থায়ী জলাবদ্ধতাকে কাজে লাগানো
- অন্য কৃষি ফসলের সাথে সমন্বিত চাষ করা যায়।

গলদা চিংড়ি চাষে সমস্যা

গলদা চিংড়ি চাষে আমাদের অভিজ্ঞতা কম। বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই এর চাষাবাদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর কারণে এখন পর্যন্ত আশানুরূপ সম্প্রসারণ ঘটেনি।

পোনা- চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। এখন পর্যন্ত পোনার মূল উৎস প্রাকৃতিক (মোট চাহিদার প্রায় ৯৫% পূরণকরে) হ্যাচারি শিল্প বিকাশমান পর্যায়ে এবং এর সফলতা এখনো সীমিত।

খাদ্য-গলদার জন্য তৈরি খাদ্যে আমিষ চাহিদা প্রায় ২৫-৩০%। কম খরচে আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান এখনো কষ্টকর।

পুঁজি- কার্পের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পুঁজি বেশি লাগে; ফলে যথাযথ ব্যবস্থাপনা অবলম্বনে সাধারণ মানুষের সমস্যা হতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনা- পানির গুণগত মান ভাল হওয়া প্রয়োজন । পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকা।

জনশক্তি- অভিজ্ঞ জনবল কম হওয়ায় প্রয়োজনীয় পরামর্শের অভাব।

অবকাঠামো- অপরিকল্পিতভাবে খননকৃত পুকুর/ঘের, পানি সঞ্চালন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

উপকরণ- প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ এখনও সর্বত্র সহজ প্রাপ্য নয়।

বাজারজাতকরণ- প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার সুবিধা এখনও পর্যাপ্ত নয়।

গলদা চাষে কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সুবিধাটাই বেশি। এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে গলদা বাংলাদেশের মাছ চাষ ও রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে। এ লক্ষ্যে এখানে কিছু সুপারিশ করা হলো-

- স্বল্প খরচের ও পরিবেশের ক্ষতি করে না, এমন চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি করা
- চাষের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করা
- ঋণ প্রাপ্তি সহজ করা
- ঘের এলাকার খালসমূহ পুনঃখনন ও খোলা রাখা
- বেসরকারি সংস্থার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন সহজ করা যাতে প্রান্তিক চাষিরা এনজিওদের সার্বিক সুবিধা পেতে পারে
- ঘেরের পাড়ে উপযোগী গাছপালা ও ঘাসের উৎপাদন বাড়াতে চাষিদের সচেতন করতে হবে
- ঘেরের পাড়ে ও পতিত জায়গায় ঘাসের উৎপাদন বাড়িয়ে গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়াতে হবে
- প্রাকৃতিক উৎসের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে সকলকে সচেতন করতে হবে
- ঘেরে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার সম্পর্কে চাষিদের সচেতনতা বাড়ানো
- পিএল এবং খাদ্যের মূল্য দরিদ্র কৃষকের ক্রয় সীমার মধ্যে আনতে হবে।

চিত্র ০১: Macrobrachium malcolmsonii

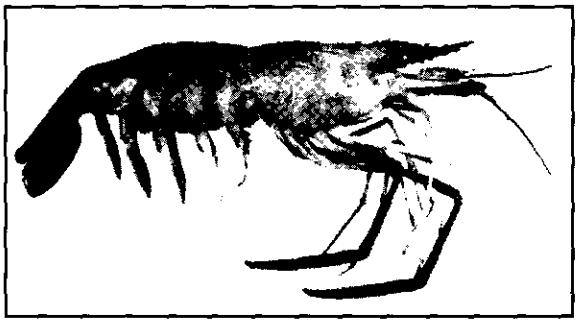

চিত্র ০২: Macrobrachium rosenbergii

চিত্র ৩ঃ চিংড়ি চাষের ফলাফল প্রদর্শক একজন শিক্ষিত যুবক

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ১ **সময় ঃ ১২:০০-১৩:৩০** **মেয়াদকাল ঃ ১ঘন্টা ৩০মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ গলদা চিংড়ির জীববিজ্ঞান ও চাষ পদ্ধতির প্রকার

লক্ষ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের গলদা চিংড়ির জীবনচক্র ও এর বিভিন্ন পর্যায়, বিস্তৃতি, বাহ্যিক গঠন ইত্যাদিসহ চাষ পদ্ধতির প্রকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যাতে তারা গলদা চিংড়ির জীববিজ্ঞান ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা গলদা চিংড়ির জীববিজ্ঞান ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	▪ স্বাগতম ▪ পূর্ববর্তী অধিবেশনের পুনরালোচনা ▪ চলতি অধিবেশনের অবতারণা ▪ চলতি অধিবেশনের গুরুত্ব	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	
বিষয়বস্তু			৭৫ মিনিট
	▪ গলদা চিংড়ির বিস্তৃতি ▪ গলদা চিংড়ির বৈশিষ্ট্য ▪ গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস ▪ গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি ও খোলস পরিবর্তন ▪ স্ত্রী-পুরুষ গলদার পার্থক্য ▪ গলদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন ▪ গলদা চিংড়ির জীবনচক্র ▪ গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি	প্রশ্নোত্তর ছোট দলীয় কাজ, বক্তৃতা, ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	▪ উদ্দেশ্য যাচাই ▪ মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা ▪ হ্যান্ডআউট বিতরণ ▪ পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ▪ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর ফ্লিপচার্ট	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হ্যান্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট পেপার, মার্কার ফ্লিপচার্ট, অনুশীলনী শীট

গলদা চিংড়ির জীববিদ্যা ও গলদা চিংড়ি চাষের প্রকারভেদ

স্বাদু পানির চিংড়িসমূহের একটি প্রজাতি গলদা চিংড়ি নামে পরিচিত, যার বৈজ্ঞানিক নাম (Macobrachium roserbergii)। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের প্রায় ৪৫০ প্রজাতির চিংড়ি আছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশে ৬৩ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় (মিঠা পানিতে ২৭টি এবং সমুদ্রে ৩৬টি প্রজাতি)। এদের মধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্বাদু পানির চিংড়ি হলো-গলদা চিংড়ি, ছটকা চিংড়ি, কাঁঠালিয়া চিংড়ি, ছোছনো চিংড়ি, ছোরিয়া চিংড়ি, রদা চিংড়ি, গোদা চিংড়ি ইত্যাদি।

গলদা চিংড়ি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রীষ্মমন্ডল ও ক্রান্তিয়মন্ডলের কাছাকাছি বেশি পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্পুচিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত দেশের নদী, হ্রদ, প্লাবন ভূমি, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি এদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। এরা নদী মোহনা হতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত পরিভ্রমণে সক্ষম।

গলদা চিংড়ির বৈশিষ্ট্য ও খাদ্যাভ্যাস

গলদা চিংড়ি পানির তলদেশে বিচরণ করে এবং সেখানকার জীবিত ও মৃত বিভিন্ন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ বস্তু ভক্ষণ করে। এ কারণে খাদ্য স্বভাবে এরা সর্বভূক। প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় এমন ছোট ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী, কুঁচো চিংড়ি, ছোট শামুক, পোকা-মাকড় ও লার্ভা, কৃমি, শেওলা, উদ্ভিদের টুকরা এদের প্রিয় খাদ্য। এরা খাদ্য সংগ্রহ করে বড় পায়ের চিমটার সাহায্যে এবং খাদ্যের উপস্থিতি অনুভব করে এ্যান্টিনার সাহায্যে। পানিতে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব থাকলে সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে খেয়ে ফেলতে পারে। বিশেষ করে খোলস বদলের সময় স্বজাতিভোজিতা বেশি দেখা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা কুঁড়া, ভূষি, দানাদার শস্য, খৈল , ফলের টুকরা, মাছের গুঁড়া, গবাদি পশুর রক্ত, শামুক-ঝিনুকের মাংস খেতে পছন্দ করে।

বৃদ্ধি ও খোলস ছাড়া

গলদার বৃদ্ধি নিরবিচ্ছিন্ন নয়। দেহ শক্ত খোলসে ঢাকা থাকে ফলে যখন খোলস বদলায় তখনই কেবল দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। খোলস পাল্টানোর অবস্থা নির্ভর করে খাদ্য, তাপমাত্রা, পানির গুণাগুণ, দেহের অবস্থা এবং কিছু হরমোনের কর্মকান্ডের উপর। খোলস পাল্টানোর পর এদের দেহ দুর্বল ও নরম থাকে। সে সময়ে এদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রয়োজন হয়। লার্ভা থেকে পোষ্ট-লার্ভায় পৌঁছুতে এরা ১১ বার খোলস পরিবর্তন করে। তবে এরা যত বড় হতে থাকে, খোলস পাল্টানোর হার ততই কমে যেতে থাকে। দৈহিক ওজন ৫০ গ্রামের ওপর হলে এ হার ১৮-২১ দিনে একবার হতে পারে। খোলসের উপর সবুজ শেওলার আবরণ পড়লে চিংড়ির বৃদ্ধি থেমে যায়। স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষের বৃদ্ধির হার বেশি।

বাহ্যিক গঠন

গলদা চিংড়ি মেরুদন্ডহীন প্রাণী। এদের দেহ শক্ত কাইটিনের আবরণে ঢাকা, যাকে বহিঃকংকাল বলে। গলদা চিংড়ির দেহ ১৯টি অংশে বিভক্ত। এর মধ্যে ৫টি অংশ মাথায়, ৮টি বুকে এবং ৬টি নিম্নাঙ্গে অবস্থিত। মাথার উপাঙ্গসমূহ খাদ্য খুঁজতে, বুকের উপাঙ্গসমূহ চলাফেরায় এবং নিম্নাঙ্গের উপাঙ্গসমূহ সাঁতার কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের মাথা ও বুকের খোলস মিশে একটি মাত্র আবরণ তৈরি করেছে যাকে শিরোবক্ষ বলে এবং শক্ত আবরণটিকে কেরাপেস (Carapace) বলে। উর্ধাঙ্গের উপাঙ্গগুলোকে ভ্রমণপদ (Periopods walking legs) এবং নিম্নাঙ্গের উপাঙ্গগুলোকে সন্তরণপদ (Pleopods) বলে। শিরোবক্ষের সামনে একটি করাত (rostrum) আছে, যা খাঁজ কাটা। এর মাধ্যমে চিংড়ির জাত বুঝা যায়। মাথার উপাঙ্গগুলোর মধ্যে এন্টিনিউল ও এন্টিনা (Antennae) স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ

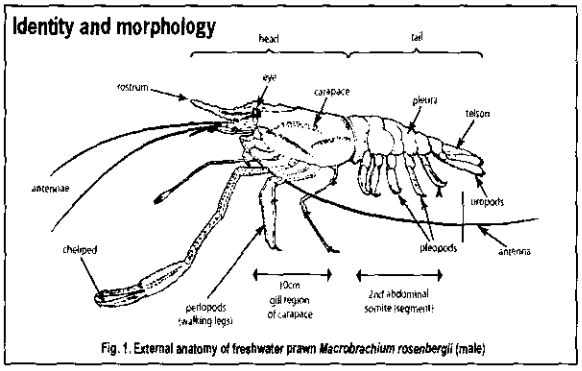

Fig. 1. External anatomy of freshwater prawn *Macrobrachium rosenbergii* (male)

চিত্র ৪ঃ চিংড়ির বহিঃবারণ

চিত্র ৫ঃ চিংড়ির বহি ও অভ্যান্তরীন অংগপ্রতংগ

করে। এন্টিনার গোড়ায় রেচন যন্ত্রের ছিদ্র আছে, যা দ্বারা মূত্র জাতীয় বর্জ্য ত্যাগ করে। চিংড়ির ফুলকা (gills) কেরাপেসের নিচে থাকে। এর সংখ্যা ৮ জোড়া যা দেখতে স্বচ্ছ। চিংড়ির রক্ত লাল নয়। রক্তে হিমোগ্লোবিন নেই। তবে রক্ত প্লাজমায় দ্রবীভূত হিমোসায়ানিন থাকে, যা শ্বাসকার্যে সহায়ক। অক্সিজেন সমৃদ্ধ অবস্থায় এর রং নীল এবং অক্সিজেনহীন অবস্থায় এর রং স্বচ্ছ। চিংড়ির হৃদযন্ত্র বুকের পৃষ্ঠে অবস্থিত। স্নায়ুতন্ত্র ও জননতন্ত্র কেরাপেসের মধ্যে থাকে। নিম্নাঙ্গ ৬টি ভাগে বিভক্ত, যা খোলস দিয়ে ঢাকা। প্রতিটি খোলসকে প্লুরা (Pleura) বলে। খোলসগুলো আর্থ্রয়ডাল মেমব্রেণ দ্বারা যুক্ত। এখানে ৫ জোড়া সন্তরণপদ (Swiming) আছে। শেষ খন্ডের শেষ প্রান্ত সরু, যাকে টেলসন বলে। উভয়পার্শ্বের পাখনাকে ইউরোপড বলে।

স্ত্রী ও পুরুষ গলদা

স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদা চিংড়ি বেশি বাড়ে, তাই একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে খানিকটা বড় হয়। শিরোবক্ষ (Cephalothorax) আকারে মোটা এবং বড় হয় আর নিম্নোদর (Abdomen) অপেক্ষাকৃত সরু দেখায়। পুরুষ চিংড়ির সহজেই নজরে পড়ে এমন একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর দ্বিতীয় ভ্রমণপদ লম্বা, মোটা এবং চিমটি বিশিষ্ট। এই দ্বিতীয় বাহুর দ্বারা পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়িকে সঙ্গমকালে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখে। পুরুষ চিংড়ির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, প্রথম উদর খন্ডের তলার খোলসের মাঝখানে একটা ছোট কাঁটার মত দেখা যায় আর দ্বিতীয় সাঁতারের পায়ের ভেতরের দিকের পত্রের (Endopodite) গোড়ায় লোমের মত এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা (Appendix masculina) থাকে। জুভেনাইল অবস্থায় পুরুষ চিংড়ি চেনার উপায় এই এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা এবং পঞ্চম জোড়া পায়ের গোড়ায় শক্ত সংযুক্ত হার দেখেই করতে হয়। কারণ তখন অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। স্ত্রী চিংড়ির মাথা ও দ্বিতীয় বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে এবং নিম্নোদরের তলারদিকে ডিম ধারণের জন্য নিম্নোদর অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়। পিঠের খোলসগুলি বড় হয় এবং উভয় দিকে নেমে এসে ডিমগুলি ঢেকে রাখতে সাহায্য করে। পুরুষের জনন অংগ পঞ্চম ভ্রমণ পদের গোড়ায়, আর স্ত্রীর যৌন অংগ তৃতীয় ভ্রমণ পদের গোড়ায় অবস্থিত। পরিপক্ক স্ত্রীর মাথার নিচে ও পার্শ্বে গোলাপী রং/কমলা রং এর আভা দেখা যায়।

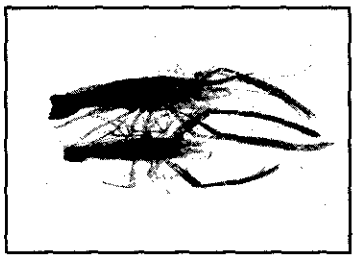

চিত্র ৬ঃ স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি

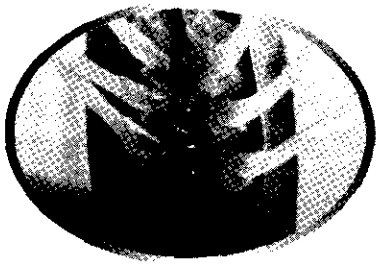

চিত্র ৬ ক ঃ স্ত্রী

চিত্র ৬ খ ঃ পুরুষ চিংড়ি

জীবন চক্র

জীবনের পর্যায়- গলদার জীবন চক্রে ৪টি অবস্থাই প্রধান। যেমন- ডিম, লার্ভা , পোষ্ট লার্ভা এবং বড় চিংড়ি।

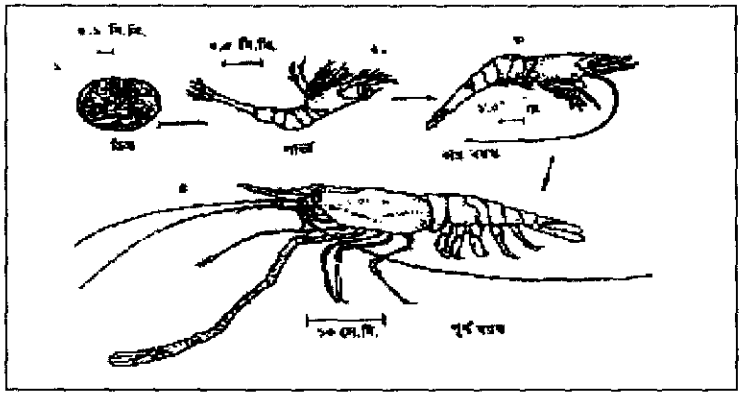

চিত্র ৭ঃ গলদা চিংড়ির জীবন চক্র

প্রজনন সময়কাল

গলদা চিংড়ি প্রায় সারা বছর প্রজননে সক্ষম হলেও ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাসই গলদার প্রধান প্রজনন কাল। মে-জুন মাসে উপকূলীয় নদীগুলোতে বেশি পোনা পাওয়া যায়।

মিলন ও ডিম পাড়া

গলদা চিংড়ি ৫-৬ মাস বয়সের মধ্যেই পরিপক্ক হয়। অনুকূল পরিবেশ ও খাদ্যের ওপর পরিপক্কতা নির্ভরশীল। স্ত্রী চিংড়ির জননতন্ত্র কেরাপেসের তলায় থাকে ও ডিম পাড়ার ২-৩ দিন আগে দেখতে কমলা রং এর মতো হয়। চিংড়ি নিশাচর প্রাণী। অধিকাংশ মূল কর্মকান্ড রাতে ঘটে, যেমন -খাদ্য গ্রহণ , খোলস পাল্টানো, সংগম এবং ডিম পাড়া । একটি পুরুষ চিংড়ি ৩-৪ টি স্ত্রী চিংড়ির সাথে সঙ্গমে সক্ষম। লার্ভার জন্যে আধা-লবণাক্ত পানি প্রয়োজন। তাই প্রজনন কালে এরা উপকূলে চলে আসে। মিঠা পানিতে প্রজনন এবং ডিম ফুটালেও লার্ভা ৪-৫ দিনের বেশি বাঁচে না। মিলনের আগে পরিপক্ক স্ত্রী খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়তে সময় লাগে প্রায় ১০-১৫ মিনিট । নতুন খোলস শক্ত হতে সময় লাগে প্রায় ৬ ঘন্টা। স্ত্রী-পুরুষ সংগম করে খোলস ছাড়ার ৩-৬ ঘন্টার মধ্যে। অর্থাৎ নরম খোলস বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে শক্ত খোলস বিশিষ্ট পুরুষের মিলন ঘটে থাকে। মিলন হয় বুকে বুকে। মিলন কালে পুরুষ চিংড়ি তার সাদা আঠালো শুক্রাধারটি (পঞ্চম ভ্রমণ পদের মাঝে) স্ত্রী চিংড়ির তৃতীয় ভ্রমণ পদের গোড়ায় জনন ছিদ্রের কাছে আটকিয়ে দেয়। এ কাজটি শেষ হতে সময় লাগে ১৫-২০ মিনিট। মিলনের ১০-১২ ঘন্টার মধ্যে স্ত্রী চিংড়ি ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো বের হওয়ার পথে শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিমগুলো পেটের তলায় সন্তরণ পদের মধ্যে অবস্থান নেয় এবং এক প্রকার আঠালো রসের সাথে আটকে থাকে। এ অবস্থায় এরা সন্তরণ পা নেড়ে ডিমে পানির সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ডিমগুলো এখানে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়ি ৫০,০০০-১,০০,০০০ ডিম পাড়তে পারে। তবে পরিপক্কতার প্রাথমিক স্তরে ৫০-১০০ গ্রাম ওজনের একটি চিংড়ি ৫,০০০-২০,০০০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

ডিম

ডিমের রং প্রথমে হলুদ ও কমলা বর্ণ থাকে এবং পর্যায় ক্রমে ১৮-২১ দিনে কালচে ধূসর রং ধারণ করে। ২৮০ সেঃ তাপমাত্রায় ডিম ফুটতে প্রায় ২০ দিন সময় লাগে। ডিম ফোটার পর স্ত্রী চিংড়ি সন্তরণ পা নেড়ে লার্ভাগুলোকে পানিতে ছড়িয়ে দেয়। ডিম থেকে লার্ভা বের হতে ২ রাত পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

চিত্র ৮ঃ ডিমের প্রথম পর্যায় হলুদ রং এবং ছাড়ার আগের ধূসর রং

লার্ভা

লার্ভা দেখতে পোকার মত। এরা লেজ ওপরে এবং মাথা নিচে রেখে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় এরা আধা লবণাক্ত (১২-১৫ পিপিটি) পানিতে অবস্থান করে এবং প্রাণিকণা খেতে শুরু করে। লার্ভার মোট স্তর ১১টি, লার্ভা অবস্থা শেষ হতে ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

পোষ্ট লার্ভা

পোষ্ট-লার্ভায় পৌঁছুনোর পর এদের স্বভাব পরিবর্তন হয়। তখন এদেরকে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মতো দেখায় এবং নদী বা খাল বা বিলের পাড়ের কাছে তলদেশে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে। এ অবস্থায় এরা অপেক্ষাকৃত বড় খাদ্য টুকরা (উদ্ভিদ ও প্রাণিজ) খেতে পারে। পোষ্ট - লার্ভার লবণাক্ততা সহনশীলতা বিস্তৃত। পোষ্ট-লার্ভা অবস্থায় আসার ৭-১৫ দিনের মধ্যে (১.৫ সেমি) তারা মিঠা পানির দিকে চলে আসতে শুরু করে। এ অবস্থায় এরা নদী স্রোতের বিপরীতে নদীর পাড় বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। প্রায় ৩০-৪০ দিনের মধ্যে পোষ্ট-লার্ভা কিশোর চিংড়িতে পরিণত হয়। ২-৩ মাস বয়সে (৬-৭ সেঃ মিঃ) এরা তরুণ এবং এর আরও ৩-৪ মাস পরে প্রাপ্তবয়স্ক চিংড়িতে পরিণত হয়।

গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি ঃ

আমাদের দেশে ২টি পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। একক চাষ পদ্ধতি ও মিশ্র চাষ পদ্ধতি।

একক চাষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গলদা চিংড়ির পোনা ঘের/ পুকুরে ছাড়া হয়। এর সাথে অন্য কোন প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় না। অধুনা একক চাষ পদ্ধতিতে কেবল মাত্র পুরুষ চিংড়ি চাষের প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে বড় হয় এবং চাষ লাভজনক।

সুবিধা ঃ - এ পদ্ধতিতে চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
-পরিচর্যা সুন্দরভাবে করা যায়।
-সহজে ধরা যায়।
-বড়গুলো সহজেই ধরে নেয়া যায়।
-খাদ্য প্রয়োগ সহজ হয়।

অসুবিধা ঃ এ পদ্ধতিতে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না।

মিশ্র চাষ পদ্ধতি

একই জলাশয়ে একই সময়ে যখন গলদা চিংড়ির সাথে অন্যান্য এক বা একাধিক প্রজাতির মাছ এক সাথে চাষ করা হয় তখন তাকে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ বলে। এ জাতীয় চাষ পদ্ধতিতে জলাশয়ের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে কেউ কারো প্রতিযোগী হয় না।

সুবিধা ঃ পুকুরের সর্বস্তরের খাবারের ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
-তুলনামুলকভাবে লাভজনক।
- রোগব্যাধি কম হয়।

অসুবিধা ঃ -গলদার সাথে চাষযোগ্য কার্পের প্রজাতি নির্বাচন সঠিক না হলে কাঙ্খিত লাভ নাও হতে পারে।
- মজুত পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় অধিক মনোযোগী হতে হয় বিধায় সব চাষির জন্য সম্ভব নাও হতে পারে।

মিশ্রচাষে প্রজাতি নির্বাচন ঃ

- গলদা চিংড়ির সাথে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কাতলা মিশ্র চাষে ব্যবহার করা যায়।
- সতর্ক থাকতে হবে যে পুকুরের তলায় বসবাসকারী ও খাদ্য গ্রহণকারী কোন প্রজাতি গলদা চিংড়ির সাথে মিশ্রভাবে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- মৃগেল, কালবাউস ইত্যাদি এছাড়া রাক্ষুসে মাছ গলদা চিংড়ির সাথে চাষ করা যাবে

চিত্র ৯ ঃ মিশ্রচাষের পুকুর

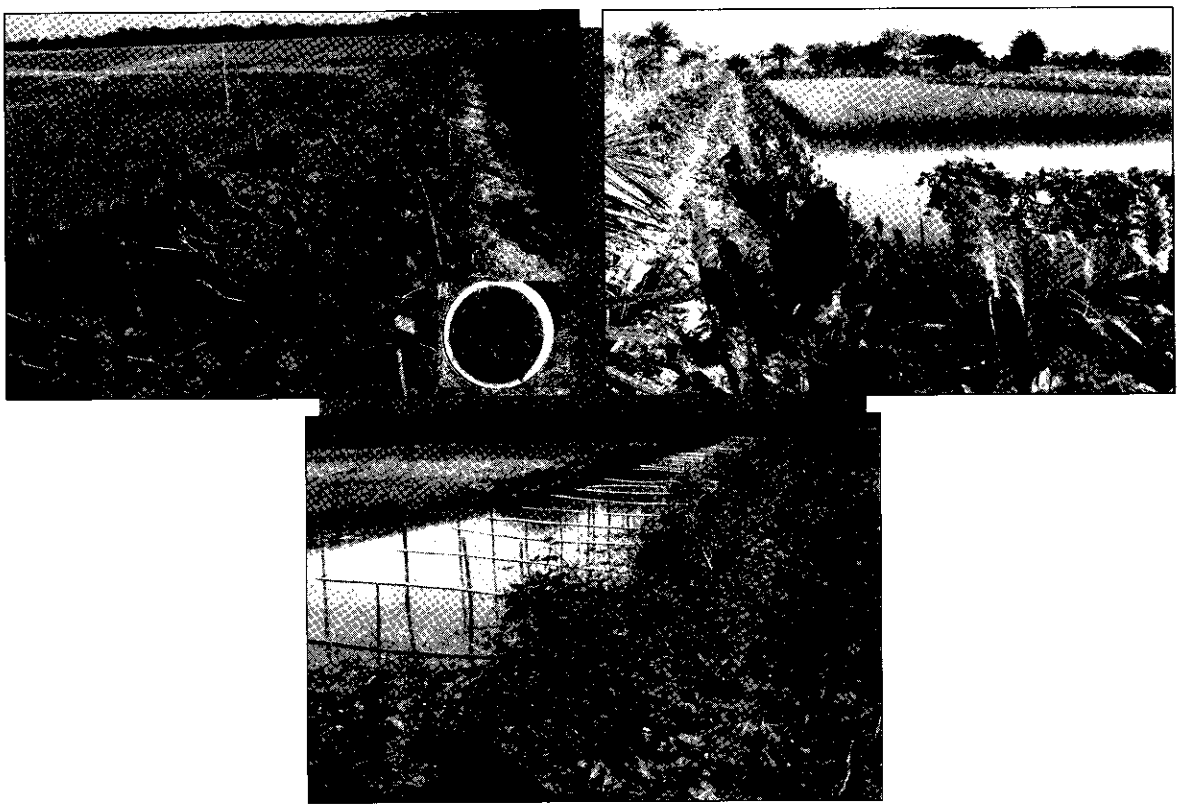

চিত্র ১০ঃ কৃষির সাথে সমন্বিত চাষ পদ্ধতি

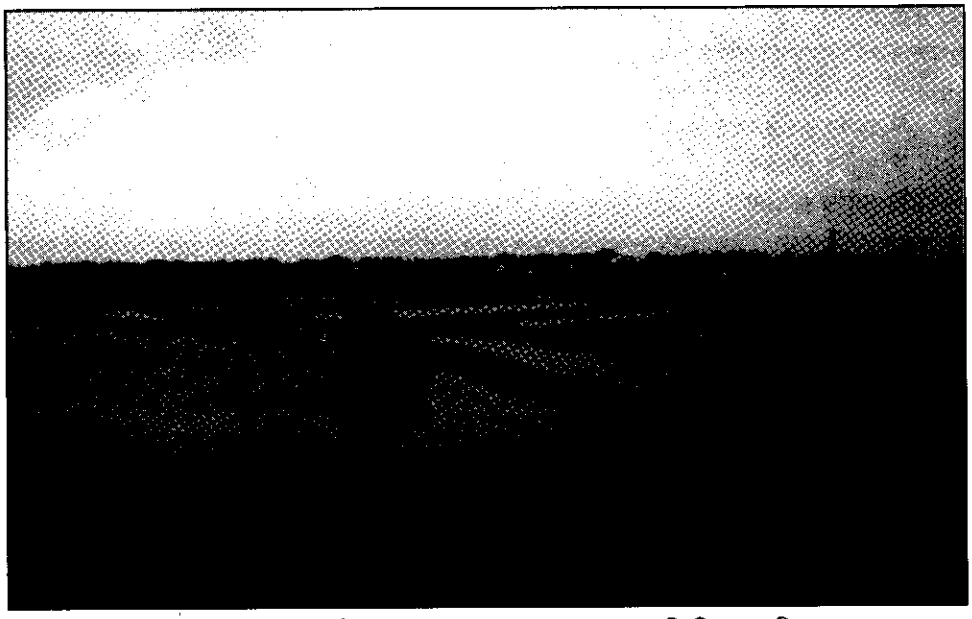

চিত্র ১১ ঃ ঘের পদ্ধতিতে ধানের পরে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একত্রিত চাষ

দলীয় অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ১ **সময়: ১৪:৩০-১৬:০০** **মেয়াদকাল: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ গলদা চিংড়ি উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ, মাটি ও পানির গুণাগুণ

লক্ষ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের গলদা চিংড়ির উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ, মাটি ও পানির গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া যাতে তারা এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তাদের গলদা চাষের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

- গলদা চিংড়ি চাষে উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গলদা টিংড়ি চাষে মাটির উপযুক্ত গুণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গলদা চিংড়ি চাষে পানির উপযুক্ত গুণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			**৫ মিনিট**
	■ স্বাগতম ■ পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ■ বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ■ উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			**৭৫ মিনিট**
	■ গলদা চিংড়ি চাষে উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ ■ মাটির গুণাগুণ ■ পানির গুণাগুণ	প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			**১০ মিনিট**
	■ উদ্দেশ্য যাচাই ■ মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা ■ হ্যান্ডআউট বিতরণ ■ পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ■ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর ফ্লিপচার্ট	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হ্যান্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, মার্কার ফ্লিপচার্ট, অনুশীলনী শীট

গলদা চিংড়ি উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ, মাটি ও পানির গুণাগুণ

গলদা চিংড়ি চাষের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ

গলদা চিংড়ি চাষের উপযোগী পরিবেশ বলতে এমন একটি পরিবেশকে বুঝায় যেখানে অবকাঠামোগত সুবিধা, পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পানির প্রাচুর্য্য, উৎপাদন সামগ্রী সহজ লভ্যতা এবং উৎপাদিত চিংড়ির সঠিক গুণগতমান বজায় রেখে রপ্তানি নিশ্চিত করা যায়। বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন গলদা চিংড়ি দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর ডোবা ও ধানক্ষেতসহ প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি চাষ করা হয়ে থাকে । এই চাষ এলাকা প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে এবং দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে এর চাষ করা সম্ভব।

গলদা চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচন ঃ

বিভিন্ন চাষ পদ্ধতির জন্য চিংড়ি খামারের সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন রকম হলেও কিছু কিছু সুবিধাদি সকল ক্ষেত্রেই একই রকম এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহও প্রায় একই ধরনের। উপযুক্ত স্থানে চিংড়ি খামার স্থাপন করলে নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যায়।

- খামার ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং ব্যবস্থাপনা খরচও কম হয়।
- পানি ব্যবস্থাপনায় কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তাই উপযুক্ত লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ সহজে করা যায়।

গলদা চিংড়ি খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি

১) দূষণমুক্ত এলাকা ঃ শহর বা শিল্প এলাকা যেখানকার বর্জ্য পদার্থ পার্শ্ববর্তী নদী/খালে পড়ে সে সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, সার ইত্যাদি দ্বারা দূষিত এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন ঝুঁকি পূর্ণ।

২) প্লাবন ও অতি বৃষ্টিজনিত ঢলমুক্ত এলাকা ঃ এ সকল এলাকায় পানির বিভিন্ন গুণাগুণ হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে চিংড়ি চাষ ব্যাহত হয়। তাছাড়া এ সকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ব্যয় বহুল ও পানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যা ক্ষতির কারণ। অতএব, এ সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম।

৩) পানির উৎস ঃ চিংড়ি খামার এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে স্বাদু পানির উত্তম স্থল থেকে সহজেই পানি খামারে ঢু-কানো ও বের করা যায় এবং পানি দূষণমুক্ত হয়। গলদা চাষ সাধারণত ভূ-গর্ভস্ত, ভূ-উপরিভাগের এবং বৃষ্টির পানির ব্যবহার করা হয়। পানির উৎসর সাথে পানির গুণাগুণের তারতম্য হয়ে থাকে।

মাটির গুণাগুণ

পৃথিবী পৃষ্ঠের যে অংশ থেকে উদ্ভিদ খাদ্য সংগ্রহ করে তাই মাটি। পুকুরের পানি সংলগ্ন ১৫-২০ সে.মি. মাটি পানির সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে।

মাটি প্রধানত ঃ চারটি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। উপাদন গুলো হচ্ছে-

১. খনিজ পদার্থ - ৪৫%
২. জৈব পদার্থ - ৫%
৩. বায়ু - ২৫%
৪. পানি- ২৫%

১. খনিজ পদার্থ

মাটির এ অংশ বালি, পলি, কাদা কণা দ্বারা গঠিত। এটাই মাটির মুখ্য উপাদান। পুকুরের মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা নির্ভর করে মাটির এই উপাদানের ওপর। যে মাটিতে অধিক পরিমাণ কাদা কণা থাকে তাকে কাদা মাটি (এটেল মাটি) , যে মাটিতে অধিক পরিমাণ পলিকণা থাকে তাকে পলিমাটি এবং যে মাটিতে অধিক পরিমাণ বালিকণা থাকে তাকে বালিমাটি বলে। কাদা মাটি ও পলি মাটির (এটেল জাতীয়) পুকুরে পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বালিমাটির পুকুরের চেয়ে বেশি।

২. জৈব পদার্থ

মাটিতে সাধারণতঃ ১-২ % হারে জৈব পদার্থ থাকে তবে দক্ষিণ অঞ্চলে তা ৫% পর্যন্ত পাওয়া যায়। পুকুরের তলার মাটির জৈব অংশের ওপর পুকুরের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহের অন্যতম উৎস তলার মাটি। তলার মাটির জৈব অংশের উৎস পুকুরের পাশের জমি ও প্রয়োগকৃত জৈব পদার্থ। তলার মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান পানিতে মুক্ত হওয়ার মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে মাটির ধরন, তাপমাত্রা, গভীরতা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি এবং ব্যাকটেরিয়ার কর্মকাণ্ডের ওপর। পুকুরের তলদেশের মাটিকে বলা হয় পুকুরের ল্যাবরে-টরি। এখানেই হাজার রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থ অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। জৈব পদার্থ পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

৩. বায়ু

বায়ু যদিও মাটির একটি অন্যতম উপাদান কিন্তু পুকুরের মাটি বলতে যা বুঝায় সে মাটিতে বায়ুর উপস্থিতি খুবই কম। জৈব-অজৈব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদিত গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া পুকুরের মাটিতে অন্য কোন গ্যাসীয় অংশ থাকে না। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট গ্যাস মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে।

৪. পানি

পুকুরের মাটি ও পানি জৈব-অজৈব ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান বিমুক্ত ও স্থানান্তরের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

মাটির রাসায়নিক উপাদান

মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির পিএইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ইত্যাদি উপাদানের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। মাছ চাষের জন্য মাটির উপরোক্ত উপাদানগুলোর মাত্রা নিম্নরূপ হলে ভাল হয়-

পিএইচ - ৬.৫-৯.০
ফসফরাস - ১০-১৫ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম
নাইট্রোজেন - ৮-১০ মি. গ্রা/১০০ গ্রাম
জৈব পদার্থ - ১-২% জৈব কার্বন।

পানির গুণাগুণ

পুকুরের উর্বরতা বা জৈব উৎপাদন নির্ভর করে পুকুরের পানির ভৌত রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। পুকুরের ভৌত রাসায়নিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে এমন উপাদানগুলি নিম্নরূপ-

ভৌত ঃ

পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, সূর্যালোক ইত্যাদি।

ভৌত ঃ

পানির গভীরতা ঃ উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলে গভীরতার কারণে সূর্যালোকের প্রভাবে পানিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি হয়। যথা- ইপিলিমনিয়ন (উপরের স্তর), থার্মোকাইন (মধ্য স্তর) হাইপোলিমনিয়ন (নিচের স্তর)। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরগুলির গভীরতা ২-৩ মিটারের মধ্যে। ফলে হাইপোলিমনিয়ন স্তরটি দেখা যায় না। উপরের স্তরই মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। নার্সারি পুকুরের গভীরতা বেশি হলে চিংড়ির পিএল পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। পিএল অগভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। নার্সারী পুকুরের গভীরতা ৬০-৭০ সে.মি. (২-২.৫ ফুট) হলে ভালো হয় এবং চাষের জন্য ১ মিটার (৩.২ ফুট) হলে উৎপাদন ভালো হয়।

তাপমাত্রা ঃ

গলদা চিংড়ির তাপমাত্রা সহনশীলতার একটি মাত্রা রয়েছে। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন এবং গলদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনে সহায়ক তাপমাত্রা ২৫°-৩১° সেঃ। ১৫°সেঃ তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রায় চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে না এবং ১০° সেঃ এর নিচের তাপমাত্রায় চিংড়ি মারা যেতে পারে।

সূর্যালোক ঃ

সূর্যই সকল শক্তির উৎস। সূর্যালোকের প্রাপ্ততা ও প্রখরতার ওপর সালোক-সংশ্লেষণ নির্ভরশীল যা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। গলদা নার্সারি পুকুরে দৈনিক কমপক্ষে ৬ -৮ ঘণ্টা সূর্যালোক পড়া আবশ্যক।

রাসায়নিক ঃ

অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্ষারত্ব ও খরতা, পিএইচ, লবণাক্ততা ইত্যাদি।

অক্সিজেন ঃ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস প্রধানতঃ দুইটি

- পানি সংলগ্ন বাতাস
- সালোক-সংশ্লেষণ

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, অন্যান্য গ্যাসের আংশিক চাপ বাড়ার সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। বায়ু চাপ বাড়লে অক্সিজেনের দ্রবনিয়তা বাড়ে । নার্সারি পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা ৫-৭ পিপিএম হলে ভাল হয়।

অ্যামোনিয়া ঃ মাছ ও চিংড়ির বর্জ্য, অভুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন দ্রব্যের পঁচন ইত্যাদির ফলে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। যার আধিক্য গলদা চাষের জন্য ক্ষতিকর। আয়নিত ও অ-আয়নিত দু'ভাবেই অ্যামোনিয়া পানিতে থাকতে পারে। তবে প্রথমটি কম ক্ষতিকর। অ-আয়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মি.গ্রা/ লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

নাইট্রাইট ঃ এটি ব্যাকটেরিয়া দহনের ফলে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইটের মধ্যবর্তী অবস্থা। পুকুরের তলার পঁচা পদার্থ বেড়ে গেলে অক্সিজেনহীন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিণত করে। নাইট্রাইটের খুব স্বল্প মাত্রাও গলদা চিংড়ির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। পানিতে নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ মি.গ্রা/লিটারের কম থাকা উচিৎ।

কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস প্রধানতঃ জৈব পদার্থের পঁচন ও জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস। মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পানির পিএইচ-এর মান ৪.৫ পর্যন্ত নামাতে পারে। ১০-১২ মি.গ্রা./ লি. যুক্ত দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গলদা চিংড়ির জন্য উপযুক্ত। কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিষাক্ততা অক্সিজেনের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। সালোক সংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজনীয় উপাদান। পানিতে এ গ্যাস বেশি থাকলে জলজ প্রাণীর অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

ক্ষারত্ব ও খরতা ঃ
পানিতে উপস্থিত কার্বনেট, বাই-কার্বনেটের ঘনত্বই ক্ষারত্ব এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর যৌথ ঘনত্বই হচ্ছে খরতা। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। পানির ক্ষারত্ব ২০ মি.গ্রা./লি. এর কম বা খুব বেশি বেড়ে গেলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, প্রাথমিক উৎপাদন কমে যায়, সারের কার্যকারিতা কমে, গলদা চিংড়ি সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। খরতার মান ৮০-২০০ মি.গ্রা./লি. হওয়া উচিত।

পিএইচ ঃ
পিএইচ হচ্ছে কোন বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের অবস্থা বুঝায় যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। ৭ দ্বারা নিরপেক্ষ মান নির্দেশিত হয়। পিএইচ এর মান ৭ এর কম হলে অম্লত্ব এবং ৭ এর বেশি হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। গলদা চিংড়ির নার্সারির ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পানির পি-এইচ-এর মান ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভালো।

লবণাক্ততাঃ
গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির চিংড়ি তবে স্বল্প লবণাক্ততায় গলদা চিংড়ির চাষ হয়। চাষের ক্ষেত্রে পানির লবণাক্ততা ০-৪ পিপিটি'র মধ্যে থাকা উচিৎ।

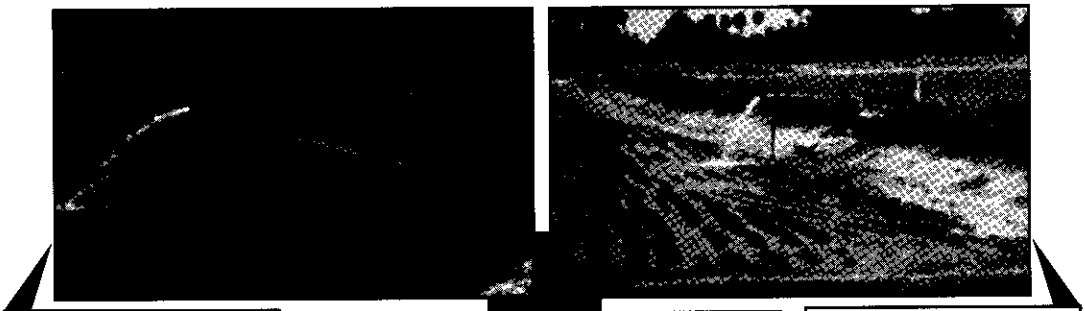

চিত্র ১২ঃ পার্শ্ববর্তি জলাধার থেকে পানি গ্রহণ।

চিত্র ১২ কঃ চাষ এলাকায় ভূ-গর্ভস্ত পানি গ্রহণ

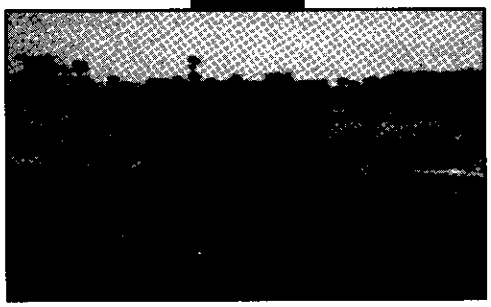

চিত্র ১৩ঃ পার্শ্ববর্তি নদী/খাল থেকে গেটের সাহায্যে পানি উত্তলন

দলীয় অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ২ **সময়: ১০:৩০-১২:০০** **মেয়াদকাল: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ পাড় মেরামত, দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ, জলজ আগাছা পরিষ্কারকরণ, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন এবং পুকুর পাড়ে বেষ্টনী নির্মাণ।

লক্ষ্য ঃ পাড় মেরামত , দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ, জলজ আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান জ্ঞান উন্নয়ন করা যাতে তারা অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর /ঘের প্রস্তুত করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- পাড় মেরামত ও দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ না করার অপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জলজ আগাছার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের অপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			**৫ মিনিট**
	▪ স্বাগতম ▪ পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ▪ বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ▪ উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			**৭৫ মিনিট**
	▪ পাড় মেরামত ও দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ না করার অপকারিতা ▪ জলজ আগাছার ক্ষতিকর দিক ▪ জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ▪ রাক্ষুসে ও বাজে মাছের অপকারিতা ▪ রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দমনের পদ্ধতি ▪ পুকুর পাড়ে নেট দ্বারা বেষ্টনী নির্মাণ পদ্ধতি	প্রশ্নোত্তর, মুক্ত চিন্তার ঝড় ও ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			**১০ মিনিট**
	▪ মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা ▪ উদ্দেশ্য যাচাই ▪ হ্যাণ্ড আউট বিতরণ ▪ পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ▪ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, জলজ আগাছা, হ্যাণ্ডআউট ইত্যাদি।

পাড় মেরামত ও দুর্গন্ধযুক্ত কালোকাদা অপসারণ, জলজ আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন এবং পুকুর পাড়ে বেষ্টনী নির্মাণ

পাড় মেরামত ও কালো কাদা অপসারণ

চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর/ঘের প্রস্তুতিকালে কখনও কখনও পাড় মেরামত ও তলার দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ পুকুর/ঘেরের পাড় ভাঙ্গা ও কালো কাদা আপসারণ করা না হলে চাষকালীন সময়ে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-

পাড় মেরামত না করলে:

- বাইরে থেকে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্ছিত মাছ প্রবেশ করতে পারে
- বর্ষা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে
- বাইরের দূষিত পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে
- ভিতরের খাদ্যযুক্ত উর্বর পানি বের হয়ে যেতে পারে

দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা আপসারণ না করলে:

- পুকুর/ঘেরের পানি দূষিত করে ফেলে
- মাছ ও চিংড়ির জন্য অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়
- তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়
- চিংড়ির রং কালো হয়ে যায় ফলে বাজার মূল্য কমে যায়
- সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়
- চিংড়ি ধরা কষ্টকর হয়

চিত্র ১৪ঃ পুকুরের তলদেশের কালো মাটি

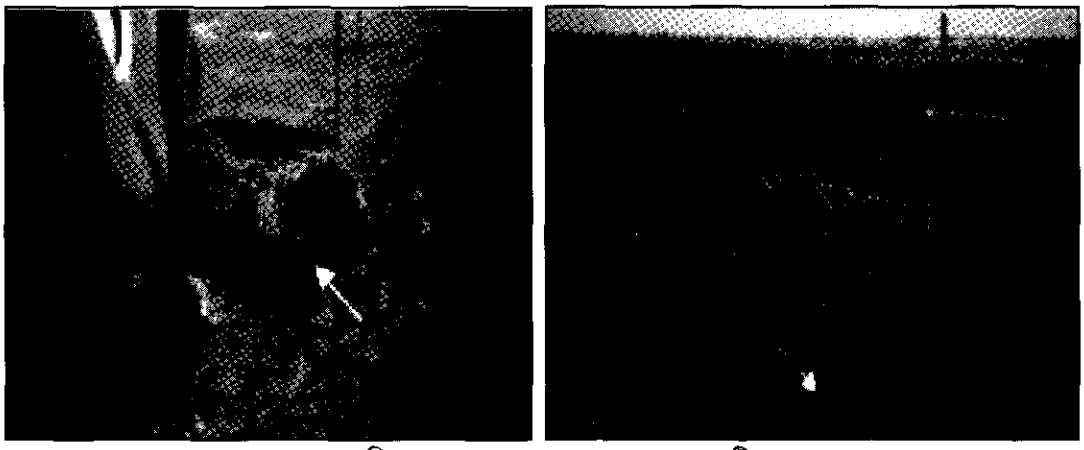

চিত্র ১৫ঃ পুকুরের তলদেশের কালো মাটি

জলজ আগাছা পরিষ্কার

পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে। পুকুরে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ধরনের জলজ আগাছা দেখা যায়। যেমন- কচুরীপানা, টোপা পানা, ক্ষুদিপানা, শাপলা, পানিফল, শুসনি শাক, কলমি লতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম, ঝাঁঝি, কাঁটা শেওলা, বিষকাটালী, আড়া-ইল, নাজাস, কাপুড়ে শেওলা, ভটকা শেওলা ইত্যাদি।

জলজ আগাছার ক্ষতিকর প্রভাব:

সব ধরনের জলজ আগাছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। চিংড়ি চাষের ওপর জলজ আগাছার উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষতিকর দিকগুলো হচ্ছে:

- এরা পুকুরের মাটি ও পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
- পানিতে সূর্যলোক প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করে, ফলে সালোক-সংশ্লেষণ বাঁধাগ্রস্ত হয়।

- মাছ ও চিংড়ির চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সহজে রাক্ষুসে প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়।
- শিকারী মাছ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- পুকুর/ঘেরে প্রয়োজনে সহজে হররা টানা যায় না।
- জাল টানায় অসুবিধা সৃষ্টি করে।
- পানিতে অতিরিক্ত শেওলার কারণে রাতের বেলা অক্সিজেন স্বল্পতার জন্য চিংড়ি মারা যেতে পারে।

জলজ আগাছার উপকারিতা ঃ

জলজ আগাছা সাধারণভাবে ক্ষতিকারক হিসেবে চিহ্নিত হলেও মাছ/চিংড়ি চাষে এদের বেশ কিছু উপকারিতাও পরিলক্ষিত হয়। টোপা পানা, ক্ষুদিপানা ছাড়াও পুকুরের নরম সবুজ ঘাস গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ভটকা শেওলা চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছা তুলে কম্পোষ্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়। উৎপাদনে পুকুর/ঘেরে পানির গভীরতা কম হলে অতিরিক্ত রৌদ্র তাপ হতে মাছ ও চিংড়িকে রক্ষার জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে হেলেঞ্চা ও টোপাপানা ব্যবহার করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে জলজ আগাছা কোন ভাবেই যেন পুকুরের মোট জলায়তনের ১০% এর বেশি ঢেকে না রাখে।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১. কায়িক শ্রম পদ্ধতি

পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা, কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। কখনও কখনও পুকুরে দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তুলে ফেলা যায়।

২. জৈবিক পদ্ধতি

অনেক মাছ আছে যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যেমন- গ্রাস কার্প। এ ছাড়া মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে। ফলে তা হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা যায়।

৩. সার প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশি পরিমাণে অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। যদি পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ যেমন নাজাজ থাকে তাহলে প্রতি শতাংশ ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মধ্যে পানির ওপর সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয়। ফলে সূর্যালোক না পাওয়ার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিদ (নাজাজ) মারা যায়।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ

পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। পুকুরে এ সব মাছের উপস্থিতি নানা ভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদনকে ব্যাহত করে। ফলে ভাল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই সমস্ত রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা উচিত।

রাক্ষুসে মাছ

যে সমস্ত মাছ অন্য মাছ বা প্রাণীকে ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। এরা চাষকৃত মাছ ও চিংড়ি খেয়ে ফেলে, ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন- শোল, চিতল, ফলি, কাকিলা, বাইল্যা, টাকি/লাটি, চ্যাং, মাগুর ইত্যাদি।

অবাঞ্চিত মাছ

যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু চাষকৃত মাছ ও চিংড়ির সাথে খাদ্য, বাসস্থান এবং অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে অবাঞ্চিত মাছ বলে। পুকুর/ঘেরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং সার্বিক উৎপাদন অনেক কমে যায়। যেমন- মলা, ঢেলা, চাপিলা, পুঁটি, চান্দা, ইচা (ছোট, চিংড়ি) বইচা ইত্যাদি।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছের ক্ষতিকর প্রভাব

চাষাবাদের পূর্বে পুকুর/ঘের থেকে রাক্ষুসে মাছ এবং বাজে মাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। কারণ:

- রাক্ষুসে মাছ চাষকৃত মাছ এবং চিংড়ির পোনা খেয়ে ফেলে। যেমন- রাক্ষুসে মাছ ১ কেজি বড় হতে প্রায় ১০-১২ কেজি অন্য মাছ খায়।
- অবাঞ্চিত মাছ চাষকৃত মাছ ও চিংড়ির খাদ্য নষ্ট করে। যেমন- ১ কেজি অবাঞ্চিত মাছ ১০- ১২ কেজি মাছের খাদ্যে ভাগ বসায়।
- উভয় ধরনের মাছ পুকুরে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটায়।
- চাষকৃত মাছ ও চিংড়ির সাথে বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন পদ্ধতি

পুকুর/ঘের হতে তিনভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যেতে পারে। যেমন-

১. পুকুর/ঘের শুকিয়ে
২. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে
৩. বার বার জাল টেনে

১.পুকুর/ঘের শুকানো

রোগজীবাণু ধবংস, পোকা-মাকড় দমন, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ মারার জন্য পুকুর/ঘের শুকনো সবচেয়ে ভাল। শ্যালো পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর/ঘের বেশ কদিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিয়ে হেটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা ডেবে না যায় । এ কাজটি ফেব্রুয়ারি - মার্চে করলে খরচ ও সময় দুই'ই কম লাগে।

২. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ

যে কোন কারণে পুকুর/ঘের শুকানো সম্ভব না হলে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে রোটেনন ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা যায়।

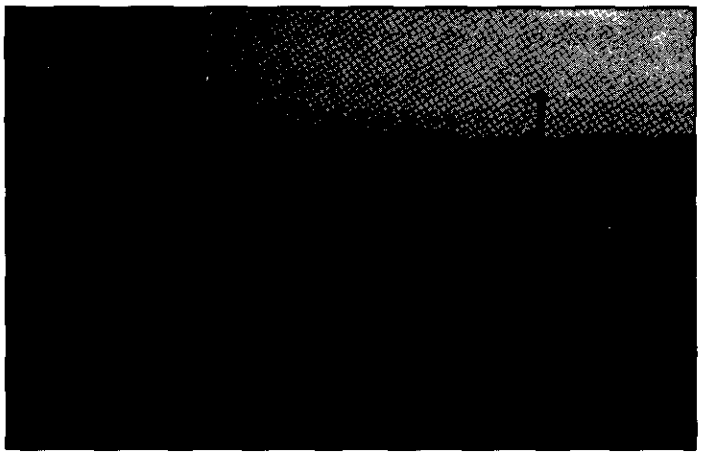

চিত্র ১৬ ঃ প্রতি ফসল তোলার পর চাষ এলাকার তলদেশ শুকানো।

রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগমাত্রা

রোটেননের প্রয়োগমাত্রা নির্ভর করে মূলতঃ এর শক্তি ও তাপমাত্রার ওপর। নিচের সারণিতে প্রতি শতাংশে এক ফুট গভীরতার জন্য বিভিন্ন ধরনের শক্তি সম্পন্ন রোটেননের সুপারিশকৃত প্রয়োগমাত্রা উল্লেখ করা হলো-

সারণি ৩ ঃ রাসায়নিক দ্রব্যের শক্তি ও ব্যবহার মাত্রা

রাসায়নিক দ্রব্যের নাম	শক্তি	ব্যবহার মাত্রা
রোটেনন	৯.১০	১৮ - ২০ গ্রাম
রোটেনন	৭.০০	৩০ - ৩৫ গ্রাম
ব্লিচিং পাউডার	-	৭৫০ গ্রাম

উল্লেখ্য যে পুকুর/ঘেরে রাক্ষুসে মাছ বেশি থাকলে প্রতি শতাংশে ১ ফুট গভীরতার জন্য ৯.১% শক্তিমাত্রার ৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ অধিক কার্যকর।

রোটেনন প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় পরিমাণ রোটেনন বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে কাঁই তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিন ভাগ করে এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল বানাতে হবে এবং বাকী দু'ভাগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে পাতলা করে গুলাতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি পাতলা অংশও সমস্ত পুকুরে সমানভাবে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ২০-২৫ মিনিট পর আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের পর পানি ওলট-পালট করে দিলে বিষের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। উল্লেখ্য রৌদ্রজ্জ্বল দিনে রোটেনন প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় ব্লিচিং পাউডার বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার পানি মিশিয়ে পাতলা করে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এই কাজটি অন্ধকার/রাত্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ২০০ পি পি এম মাত্রায় ৩৫% ক্লোরিন যুক্ত ব্লিচিং পাউডার দ্বারা অনাহুত মাছ মারা যায়।

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা

- ব্যবহারের পূর্বেই শুধু পাত্রের মুখ খুলতে হবে
- বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে
- ব্যবহারের পূর্বে নাকে-মুখে গামছা বেঁধে নিতে হবে
- অবশ্যই বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে

সঠিকভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য পানির গভীরতা খুব ভালভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পুকুরের অগভীর এবং গভীর অংশের পানির গভীরতার গড় বের করতে হবে। সাধারণভাবে পুকুরের অন্ততঃ ২০ টি স্থানের গভীরতার মাপ নেয়া উচিত। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

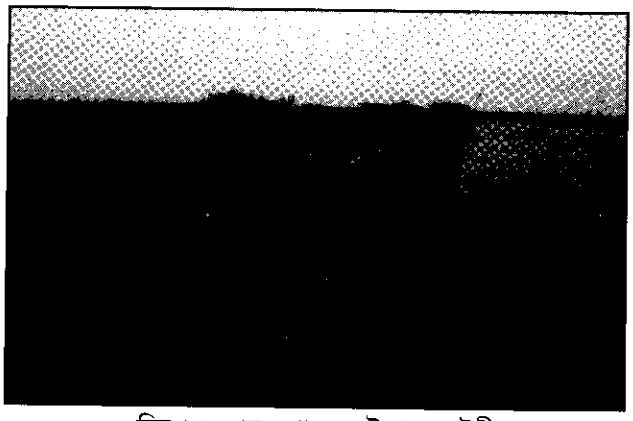

চিত্র ১৭ঃ পুকুর পাড়ে নেট দ্বারা বেষ্টনী

৩. বার বার জাল টানা

পুকুর/ঘের শুকানো বা বিষ প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে খুব ভালভাবে জাল টেনেও রাক্ষুসে মাছ ও আগাছা দূর করা যায়। ছোট এবং কম গভীর পুকুর/ঘেরে জাল টেনে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে। তবে তুলনামূলকভাবে বড় এবং বেশি গভীর পুকুর/ঘেরে জাল টেনে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করা খুব কঠিন। সে কারণে পুকুর/ঘেরে জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন খুব একটা কার্যকর নয়।

পুকুর পাড়ে নেট দ্বারা বেষ্টনী নির্মাণ ঃ

বৃষ্টির সময়, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় গলদা চিংড়ি পুকুর কিনারায় উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুকুর প্রস্তুতির পর জুভেনাইল মজুদের পূর্বে পুকুরের/ঘেরের পাড় দিয়ে ৩ (তিন) ফুট উচু মশারীর নেট/জাল দিয়ে বেষ্টনী (Fencing) নির্মাণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য মশারীর নেট পাড়ের মাটি ৩´´- ৪´´ গর্ত করে পুতে দেয়া উচিত, যেন সহজে নেট উঠে না যায়। এর ফলে বাহির থেকে ক্ষতিকর ও রাক্ষুসে প্রাণী চাষ এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না।

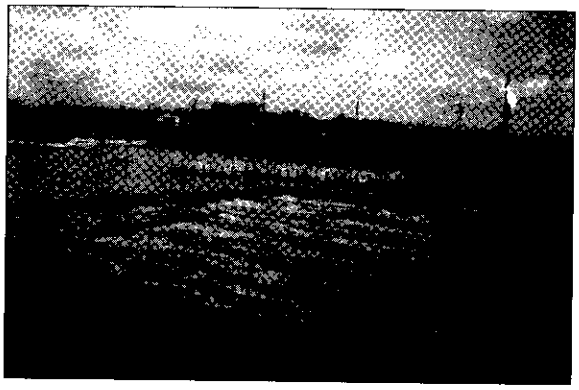

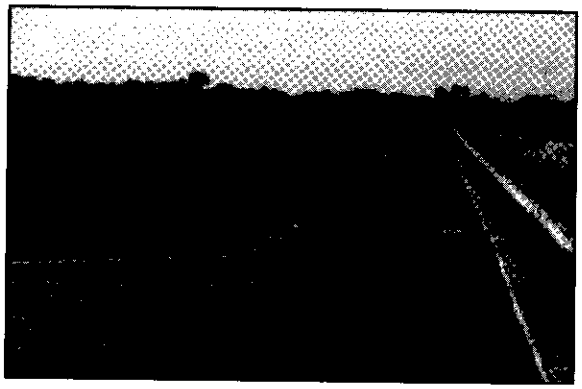

চিত্র ১৮ঃ পুকুর পাড়ে নেট দ্বারা বেষ্টনী

দলীয় অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ২ **সময়: ১২:০০-১৩:৩০** **মেয়াদকাল: ১ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ ও পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ ও পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হবে যাতে তারা অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পুকুর/ঘেরে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- চুনের উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- চুনের প্রকার, প্রয়োগ মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সার প্রয়োগের উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সারের প্রকার ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পানির উপযুক্ততা পরীক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	■ স্বাগতম ■ পূববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগস্থাপন ■ বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ■ উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা, প্রশ্ন-বিরতি-নাম	
বিষয়বস্তু			৭৫ মিনিট
	■ চুনের উপকারিতা ■ চুনের প্রকার, প্রয়োগ মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ■ সার প্রয়োগের উপকারিতা ■ সারের প্রকার ■ কম্পোষ্ট তৈরির নিয়ম ■ সার প্রয়োগ পদ্ধতি ■ পানির উপযুক্ততা পরীক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতি	প্রশ্নোত্তর, মুক্ত চিন্তার ঝড় ও ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	■ মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা ■ উদ্দেশ্য যাচাই ■ হ্যান্ডআউট বিতরণ ■ পরবর্তী অধিবেশনের ওপরে আলোকপাত ■ ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, প্রকৃত বস্তু, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি

চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ ও পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা

চুন প্রয়োগের উপকারীতা ঃ

চাষ ক্ষেত্রে চুন প্রয়োগ জরুরি একটি কাজ। চুনের উপকারীতা নিম্নরূপঃ

- পানির পি এইচ মান ৭.৫ এর ওপরে রাখা
- চিংড়ির খোলস বৃদ্ধিতে সহায়তা করা
- পুকুর/ঘের প্রস্তুতকালীন সময়ে বিশেষতঃ পোড়া চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবী ও রোগ জীবাণু দূর করা
- পুকুর/ঘেরের তলায় অবস্থিত জৈব পদার্থের পঁচন হার বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি করে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করা
- উদ্ভিদকণা বৃদ্ধির জন্যে কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়া
- পানির ঘোলাত্ব দূর করা
- সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা

চুনের প্রকারভেদ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়, যেমন- কৃষি চুন, ($CaCo_3$) পোড়া চুন (Cao) বাজারে পাথুরে চুন হিসেবে পরিচিত), কলি চুন (CaoH) ও ডলোমাইট ($CaMaCo_3$)

চুন প্রয়োগের মাত্রা

পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে মাটিতে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে পোড়া চুন প্রয়োগ করতে হবে। অন্য চূন এর দ্বিগুণ হারে প্রয়োগ করতে হয়। চাষকালীন সময় এ মাত্রা ২০% এর কম থাকা উচিৎ।

প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনা ও ভেজা মাটির পুকর/ঘেরে প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় চুন গুড়া করে ঢালসহ সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পানি ভর্তি পুকুরে প্রয়োজনীয় চুন মাটির চাড়ি বা ড্রামে গুলিয়ে ঢালসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগের সময়

শুকনা পুকুর/ঘেরে চাষ দেয়ার ১-২ দিন পর
মাটি ভেজা পুকুর/ঘেরে পানি সেচের ১-২ দিন পর
পানি ভর্তি পুকুর/ঘেরে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন আগে

চুন প্রয়োগে সতকর্তা

১. চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক-মুখ গামছা দিয়ে বাঁধতে হবে
২. কোন অবস্থাতেই প্লাষ্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না
৩. পাত্রে চুন রেখে তার পর পানি ঢালতে হবে। চুনের পাত্রে পানি ঢালার আগে পাত্রের মুখ অবশ্যই চট/বস্তা দিয়ে ঢাকতে হবে
৪. বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে
৬. চোখে চুন লাগলে পরিস্কার পানি দিয়ে সাথে সাথে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য

পানিতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকণা মাছ ও চিংড়ির প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। খাদ্যকণা দু'ধরনের, উদ্ভিদ কণা ও প্রাণী কণা। দু'ধরনের খাদ্যকণার মধ্যে প্রাণীকণাই হচ্ছে অধিকাংশ মাছ ও চিংড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক খাদ্য। প্রায় সমস্ত চাষযোগ্য মাছ ও চিংড়ি এদের ওপর নির্ভরশীল। অন্য দিকে উদ্ভিদকণা ও ব্যাকটেরিয়া খেয়ে প্রাণীকণা বিস্তার লাভ করে। মোট কথা ঘের/পুকুরে মাছ ও চিংড়ির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারের প্রকারভেদ

জৈব ও অজৈব দু'ধরনের সারই ঘের/পুকুরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কারণ জৈব সার সরাসরি প্রাণিকণা এবং ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে কাজ করে। পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে উদ্ভিদকণা উৎপাদনে সাহায্য করে। ঘের/পুকুরে জৈব কম্পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে জৈব সার হিসেবে গোবর ও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, গোবর ও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠার মধ্যে বিদ্যমান ক্ষতিকর রোগ-জীবাণু মাছ ও চিংড়ির গুণগত মান নষ্ঠ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে গোবর ও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠাকে কম্পোষ্ট সারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

সারণি ৪ঃ কম্পোষ্ট সার তৈরির উপাদান অনুপাত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রয়োজনীয় উপাদান	শতকরা হার	মন্তব্য
সবুজ উদ্ভিদ	৮৮ ভাগ	সবুজ উদ্ভিদ কুচিকুচি করে কেটে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশিয়ে বানালে দ্রুত পচনক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
গোবর/ হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা	১০ ভাগ	
চুন	১ ভাগ	
ইউরিয়া	১ ভাগ	

সার প্রয়োগের মাত্রা

সারণি ৫ঃ ঘের/পুকুর প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ-

সারের নাম	প্রয়োগমাত্রা (প্রতি শতাংশে)
কম্পোষ্ট	৫ - ৭ কেজি
ইউরিয়া	১০০ - ১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ - ৭৫ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনো পুকুর/ঘের ঃ প্রয়োজনীয় জৈব সার সমানভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে শুকানোর পর তলায় একটি গর্ত খুড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল। প্রয়োজনে উপরে উল্লিখিত মাত্রার জৈব সারের সাথে কিছু সরিষার খৈলও (০.৫ কেজি / শাতংশ) মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ত ঘের/পুকরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভর্তি পুকুর/ঘের ঃ

টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে উক্ত মিশ্রণের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে সমানভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে পুকুর/ঘেরের আয়তন খুব বড় হলে জৈব সার পানিতে গুলে প্রয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। সে ক্ষেত্রে জৈব সার শুকনা অবস্থায় সতর্কতার সাথে সমানভাবে ছি-টিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগের সময়

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং পিএল (চিংড়ি রেণু) অথবা জুভেনাইল মজুদের ৮-১০ দিন আগে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ করতে হয়। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা গেলেও সাধারণতঃ রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

সার প্রয়োগের সতর্কতা

- অম্লীয় মাটিতে সারের কার্যকারিতা কম হয়। অধিক বা কম পিএইচ-এ ফসফরাস দ্রুত তলানি পড়ে।
- ঘোলা পানিতে সারের কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- পানিতে জলজ উদ্ভিদ থাকলে সারের কার্যকারিতা কম হয়। কারণ পুষ্টিকর পদার্থ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের চেয়ে আগাছাই বেশি গ্রহণ করে থাকে।
- পুকুরে পানির স্থায়ীত্ব তিন সপ্তাহের কম হলে সারের কার্যকারিতা কম হবে।
- গভীর পানিতে ফসফরাস কাদায় তলানী হিসাবে আবদ্ধ থাকে ফলে এর কার্যকারিতা কমে যায়।
- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পরিমিত পানিতে খুব ভালভাবে গুলে নিলে কার্যকারিতা বেশি হবে।
- মেঘলা দিন বা বৃষ্টির মধ্যে সার প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।

পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা

পুকুরে পিএল (চিংড়ির রেণু) অথবা জুভেনাইল ছাড়ার আগে পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা করা অপরিহার্য। পানির উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য পুকুরের পানিতে একটি হাপা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন হাপার তলদেশ কাদা স্পর্শ করে। এরপর হাপার ভিতরে ১৫-২০ টিপিএল (চিংড়ির রেণু) অথবা জুভেনাইল ছাড়ে ২৪-৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পানিতে কোন সমস্যা না থাকলে সবগুলি পিএল অথবা জুভেনাইল বেঁচে থাকবে অথবা দু-একটি মারা গেলে তা স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। পানিতে কোন সমস্যা দেখা দিলে মজুদ কার্যক্রম স্থগিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুকুরে/ঘেরে ঘন ঘন হররা টানলে অথবা বাড়তি কয়েকদিন অপেক্ষা করলে সমস্যার সমাধান হবে।

চিত্র ১৯ঃ পানি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ২ **সময় ঃ ১৪:৩০-১৬:০০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ আশ্রয়স্থল স্থাপন, প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ, ভাল মানের জুভেনাইল সনাক্তকরণ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণ চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন, প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ এবং ভাল মানের জুভেনাইল সনাক্তকরণ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হবে যাতে তারা এগুলো চাষের সময়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব ও কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রজাতি নির্বাচনের গুরুত্ব সর্ম্পকে বলতে পারবেন।
- একক ও মিশ্রচাষের মজুদ ঘনত্ব সর্ম্পকে বলতে পারবেন।
- ভাল জুভেনাইল এবং মাছের পোনা সনাক্তকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	■ স্বাগতম ■ পূর্ববর্তী অধিবেশনের পুনরালোচনা ■ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ■ উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৬৫ মিনিট
	■ আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব ও কৌশল ■ প্রজাতি নির্বাচন ■ মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ ■ ভাল ও খারাপ জুভেনাইলের বৈশিষ্ট্য ■ ভাল ও খারাপ মাছের পোনার বৈশিষ্ট্য	প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে আলোচনা, ছোট দলীয় অনুশীলনী।	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	■ মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা ■ উদ্দেশ্য যাচাই ■ হ্যাণ্ড-আউট বিতরণ ■ পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ■ ধন্যবাদ জ্ঞাপন		

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইড বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি

আশ্রয়স্থল স্থাপন, প্রজাতি নির্ধারণ, ভালমানের জুভেনাইল সনাক্তকরণ

আশ্রয়স্থল স্থাপন

খোলস বদলের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। তখন এদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। কারণ সব চিংড়ি একই সময়ে খোলস বদলায় না। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দুর্বলগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। পুকুর/ঘেরের তলায় কিছু জলজ উদ্ভিদ থাকলে (হাইড্রিলা, নাজাস) তা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়াও তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা, বাঁশের কঞ্চি, ভাঙ্গা প্লাষ্টিকের পাইপ, ভাঙ্গা কলসের টুকরা, গাছের ডাল (হিজলের শুকনা ডাল উত্তম) ব্যবহার করে চিংড়ির আশ্রয়স্থল তৈরি করে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব

- চুরির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- উচ্চ তাপমাত্রা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- খোলস পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিবেশ থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- সাবষ্টেটাম হিসেবে প্রাকৃতিক খাদ্য (পেরিফাইটন) জন্মাতে সাহায্য করে।
- রাক্ষুসে প্রাণীর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- চিংড়ির পানি বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে।
- একটি চিংড়ি অন্য চিংড়ির ক্ষতি করতে পারে না।

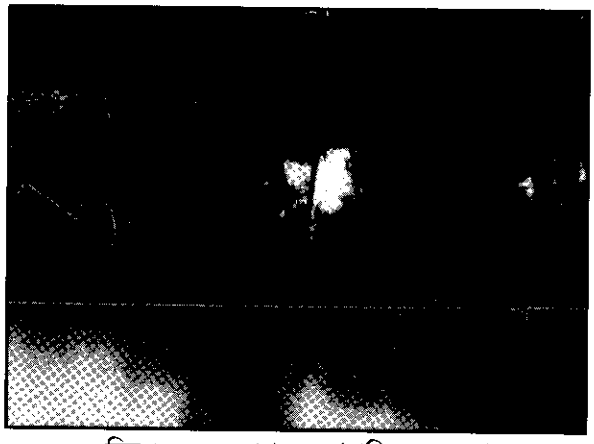

চিত্র ২০ ক ঃ আশ্রয়স্থল (নারিকেল পাতা)

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল

তাল বা নারিকেলের পাতা এমন ভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু ওপরে থাকে। বাঁশের কঞ্চি পৃথকভাবে অথবা প্লাষ্টিকের পাইপও পুকুরে পুতে রাখা যায়। প্লাষ্টিক নেট টানিয়ে আথবা নেট দিয়েও আশ্রয়স্থল তৈরি করা যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমাণ

চাষ এলাকার ২০% এলাকায় আশ্রয়স্থল তৈরি করা হলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সময়

পিএল বা জুভেনাইল মজুদের ১-২ দিন আগে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সতর্কতা

- কোন অবস্থাতেই কাঁচা পাতাসহ ডাল বা কঞ্চি পুকুরে দেয়া যাবে না।
- কয়েক মাস পর পর ডাল বা কঞ্চি তুলে শুকিয়ে পুনরায় ঘের/পুকুরে দিতে হবে।
- প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রবাদি যা পানিতে পঁচেনা তা দিয়ে আশ্রয়স্থল তৈরী করাই শ্রেয়।

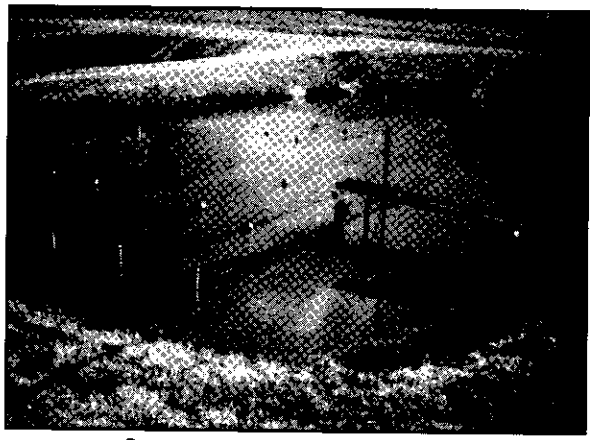

চিত্র ২০ খ ঃ আশ্রয়স্থল (কৃত্রিম নেট)

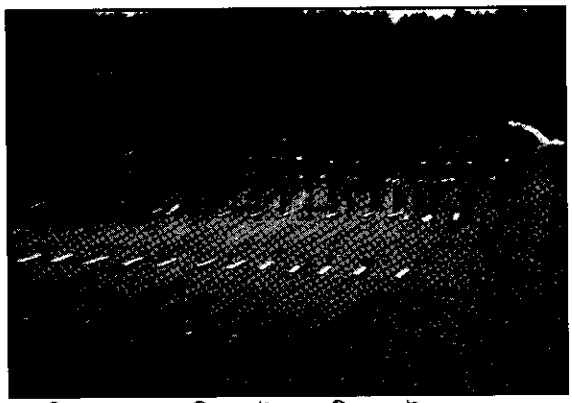

চিত্র ২০ গ ঃ প্লাষ্টিক নেট ও প্লাষ্টিক নেটের আশ্রয়স্থল

চিত্র ২০ ঘ ঃ নেটের আশ্রয়স্থল

চিত্র ২০ ঙ ঃ প্লাষ্টিক নেটের আশ্রয়স্থল

প্রজাতি নির্বাচন

মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের মূল ভিত্তি হচ্ছে পুকুর/ঘেরের পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা। পুকুর/ঘেরের পানির উপর স্তর, মধ্য স্তর ও তলার স্তরে আলাদা আলাদা প্রাকৃতিক খাবার জন্মায়। অন্যদিকে পুকুরে যে সব প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি চাষ করা হয় এদের খাদ্যাভাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এরা পানির বিভিন্ন স্তরে বাস করে সাধারণত সেখান থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কাতলা, সিলভার কার্প ও বিগহেড পানির উপরের স্তরে, রুই মধ্য স্তরে এবং মৃগেল, কার্পিও, মিরর কার্প ও চিংড়ি পানির নিচের স্তরে বাস করে। কেবলমাত্র সরপুটি ও গ্রাসকার্প মাছ পানির সকল স্তরে বিচরণ করে। সে কারণে পুকুরে যদি শুধুমাত্র কোন একস্তরে বসবাসকারী মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় তাহলে এরা ঐ স্তরের খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে কিন্তু অন্য স্তর অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাবে। বিষয়টিকে জমিতে বীজ বপনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এক বিঘা জমির জন্য যে পরিমাণ বীজ দরকার তা যদি ১০ শতাংশ পতিত রেখে বাকী ১০ শতাংশে বপন করা হয় তাহলে কখনও ভাল ফসল আশা করা যায় না। ঠিক একইভাবে পুকুরের সকল স্তরের ব্যবহার নিশ্চিত না করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মজুদ করার পরও ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ পোনা মজুদের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পুকুরের সকল স্তরের খাদ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এ ধরনের চাষকে মিশ্র চাষ বলে যা একক চাষের চেয়ে লাভজনক। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে শুধুমাত্র কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে ৬-৭ প্রজাতির পোনা মজুদ করা গেলেও কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষে মৃগেল, কার্পিও বা মিরর কার্পের পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। কারণ এরা খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য চিংড়ির সাথে প্রতিযোগিতা করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঘের চাষিদের মতে চিংড়ির সাথে মিশ্রচাষের জন্য কাতলা, সিলভার কার্প, রুই ও গ্রাসকার্প হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী প্রজাতি। তবে বিগহেড এবং সরপুটিও লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। চিংড়ির সাথে চাষের জন্য উপরোক্ত প্রজাতিগুলোর এলাকাগত প্রাপ্যতা বিবেচনা করেই প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়।

মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ

পুকুরের সকল স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাছের পোনা ও জুভেনাইল মজুদের ওপর মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। অতি ঘনত্বে মাছের পোনা ও চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, অক্সিজেন ও বাসস্থানের তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। যার কারণে আশানুরূপ উৎপাদন এবং লাভ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করলেও মোট উৎপাদন কমে যায়। সে কারণে পুকুরের সার্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করতে হয়। নিচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো -

পুকুর উৎপাদনশীলতা

মাটি ও পানির গুণাগুণভেদে কোন একটি জলাশয়ে মাছের পোনা ও চিংড়ির জুভেনাইলের মজুদ ঘনত্ব কম বেশি হতে পারে। যেমন- বেলে ও এটেল মাটির উৎপাদনশীলতা দো-আঁশ মাটির চেয়ে কম। ফলে দো-আঁশ মাটির পুকুরে উহাদের মজুদ ঘনত্ব অন্যান্য মাটির পুকুরের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে।

কাঙ্খিত উৎপাদন আকার

যদি নির্দিষ্ট সময়ে বড় আকারের মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করতে (৫-৬ মাসে মাছ ৫০০ গ্রাম-১ কেজি এবং চিংড়ি > ৮০ গ্রাম) হয় তবে কম ঘনত্বে পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করা উচিত। মজুদ ঘনত্ব বেশি হলে একই সময়ে মাছ ও চিংড়ির গড় ওজন কম হবে।

পোনা আকার

পুকুরে বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইল (মাছ ১০-১৫ সেমি এবং চিংড়ি ৫-৭ সেমি) মজুদ করা হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মজুদের সময় বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইল পাওয়া যায় না; ফলে ছোট আকারের পোনা ও জুভেনাইল কিছুটা বেশি ছাড়া যায়। বড় আকারের পোনা বা জুভেনাইলের ক্ষেত্রে মজুদ ঘনত্ব ২৫% কম হতে পারে।

পুকুরের ধরন

পুকুরের ধরনের ওপরও মাছ ও চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে। সে কারণে মৌসুমী ও বাৎসরিক পুকুরের মজুদ ঘনত্ব ভিন্ন হয়ে থাকে। চাষের নিবিড়তার সাথেও মজুদ ঘনত্বের তারতম্য হয়ে থাকে।

চাষের ধরন

চাষের ধরন যেমন- একক ও মিশ্রচাষে মজুদ ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। চাষের নিবিরতার সাথেও মজুদ ঘনত্বের তারতম্য হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনার ধরন

পুকুরে শুধুমাত্র সার ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু বেশি হতে পারে। আবার জলাশয়ে আংশিক পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকলে আরও অধিক ঘনত্বে মজুদ করা যেতে পারে। কোন পুকুরে পোনার মজুদ ঘনত্ব ও মজুদ হার প্রকৃতই উহার ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী ও চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে নিচে একক ও মিশ্রচাষের কিছু নমুনা ঘনত্ব উল্লেখ করা হলো-

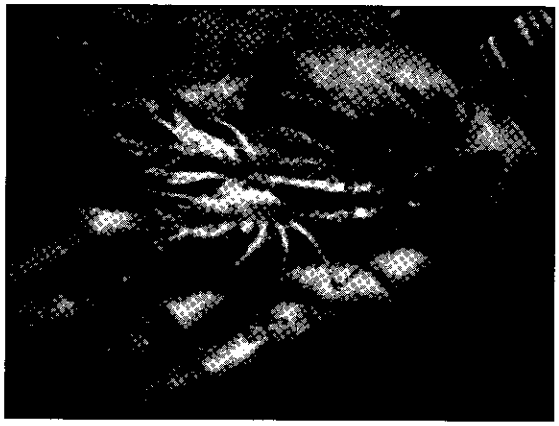

চিত্র ২১ ঃ স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি পোনা বাছাই করণ

১. মৌসুমী পুকুর

একক চাষ ঃ গলদা চিংড়ি- ৫৫ টি পোনা/ শতাংশ । তবে খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে এই মজুদ ঘনত্ব দেড় থেকে দুইগুণ বাড়ানো যায়

২. মিশ্র চাষ ঃ মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ

সারণি ৬ ঃ

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২
গলদা	৬০	৬০
সিলভার কার্প	১৫	১০
সরপুটি/রুই	৫	১০
মোট	৮০	৮০

২. বাৎসরিক পুকুর

একক চাষ ঃ গলদা চিংড়ি ৫০-৭০টি/ শতাংশ। প্রতি পালনের সময় ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে এই মজুদ ঘনত্ব আরও দেড় থেকে দুইগুণ করা যায়।

সারণি ৭ ঃ কার্প চিংড়ি মিশ্রচাষ মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ

প্রজাতি	আকার (সেঃ মিঃ)	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-৪	মন্তব্য
গলদা চিংড়ি	৩-৫	৫০-৬০	৫০-৬০	৫০-৬০	৫০-৬০	চিংড়ির আকার ৬-৮ সে.মি. হওয়ার পর ১০-১৪ সে.মি. আকারের কার্প পোনা মজুদ করতে হবে।
কাতলা	৭-১০	২-৩	১০-১১	-	৪-৫	
সিলভার কার্প	৭-১০	৯-১০	-	৯-১০	৫-৬	
বিগহেড	৭-১০	-	-	২-৩	-	
রুই	৭-১০	৪-৫	৫-৬	৫-৬	৫-৬	
গ্রাসকার্প	১০-১৫	-	১-২	১-২	২-৩	
সরপুটি	৩-৫	২	-	-	-	
মোট		৬৭-৮০	৬৬-৭৯	৬৭-৮১	৬৬-৮০	

বিঃ দ্রঃ গলদা-কার্প মিশ্রচাষে গ্রাস কার্প মজুদ না করাই ভাল। যদি মজুদ করতেই হয় তবে প্রতিদিন গ্রাস কার্পের ওজনের নির্দিষ্ট মাত্রায় সবুজ পাতা জাতিয় খাদ্য অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

৩. ঘের

ঘেরে বিভিন্ন কৌশলে পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করে চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে সে কারণে মজুদ ঘনত্বেও তারতম্য দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের চাষ কৌশলের ওপর ভিত্তি করে মজুদ ঘনত্বের নমুনা উল্লেখ করা হলো-

ক.ঘেরটি যখন পুরোপুরি বড় চিংড়ি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়-

সারণি ৮ ঃ

প্রজাতি	আকার (সেঃমিঃ)	পরিমাণ (প্রতি শতাংশে)
গলদা	৩ - ৫	৭০ - ৮০
কাতলা	৭ - ১০	৬ - ৮
সিলভার কার্প	৭ - ১০	৬ - ৮
রুই	৭ - ১০	৪ - ৬
গ্রাস কার্প	১০ - ১৫	০ - ১
মোট		৮৫ - ১০০

খ. ঘেরটি প্রথমে নার্সারি ও পরে মজুদ কাজে ব্যবহৃত হলে ১০০-১২০ টি পিএল/শতাংশ
গ. ঘেরটি পুরোপুরি নার্সারি হিসেবে ব্যবহৃত হলে ১০০০-২০০০ টি পিএল/শতাংশ

ভালমানের জুভেনাইল ও পোনা সনাক্তকরণ

শুধু সঠিক সংখ্যায় পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে না। বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভাল মানসম্পন্ন সুস্থ সবল পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। পোনা ও পিএল বা জুভেনাইলের উৎস এবং হ্যান্ডেলিং উহাদের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। যে কোন কারণেই উহাদের গুণগত মান খারাপ হোক না কেন ঐ সমস্ত পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করা হলে চাষি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যথাযথ মান সম্পন্ন পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ না করা হলে-

- মজুদের পর ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে
- বৃদ্ধির হার কম হয়
- সময়মত বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় বাজার মূল্য কম পাওয়া যেতে পারে
- বেশি খাদ্য ব্যবহার হতে পারে যা অলাভজনক

সে কারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে উহাদের যথাযথ গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভাল ও খারাপ পোনা ও জুভেনাইল সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য হলো -

চিংড়ির জুভেনাইল

- ভাল জুভেনাইলের দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রংয়ের, খারাপ জুভেনাইল লালচে/ কালচে।
- ভাল জুভেনাইলের এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙ্গা থাকে না ।
- ভাল জুভেনাইলের খোলস পরিস্কার কিন্তু খারাপ জুভেনাইলের খোলস কালচে ও শেওলাযুক্ত।
- ভাল জুভেনাইলের খাদ্য নালী পরিপূর্ণ, খারাপ জুভেনাইলে খাদ্য নালি আংশিক পরিপূর্ণ বা খালি থাকে।
- ভাল জুভেনাইলের চলাচল বেশ চঞ্চল এবং দৃঢ়। চোখ দৃঢ় ও গায়ের রং উজ্জ্বল।

মাছের পোনা

- সুস্থ্য সবল পোনা চঞ্চল, সন্তরণশীল কিন্তু খারাপ পোনা ধীরস্থির।
- ভাল পোনার আঁইশ ঝকমকে উজ্জ্বল, খারাপ পোনার দেহ ফ্যাকাসে।
- ভাল পোনার দেহ পিচ্ছিল, খারাপ পোনার দেহ খসখসে।
- ভাল পোনার দেহে কোন দাগ নাই, খারাপ পোনার দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ দেখা যায়।

চিত্র ২২ ঃ হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল

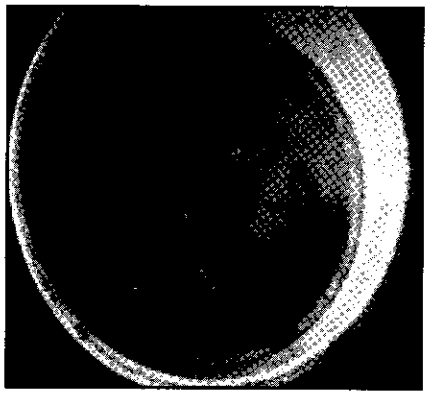

চিত্র ২৩ ঃ সুস্থ সবল পোনা নার্সারি থেকে বাছাই করা

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ৩ **সময় ঃ ১০:৩০-১২.০০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ, খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তি

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ, খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সঠিকভাবে সুস্থ ও সবল অবস্থায় পিএল/জুভেনাইল তাদের পুকুর/ঘেরে মজুদ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা খাপ খাওয়ানো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা সঠিকভাবে অবমুক্ত করতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			**৫ মিনিট**
	■ স্বাগতম ■ পূর্ববর্তী অধিবেশনের পুনরালোচনা ■ চলতি অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			**৭৫ মিনিট**
	■ পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ ■ পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা খাপ খাওয়ানো ■ পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা অবমুক্তি ■ উদ্বুদ্ধকরণ	প্রশ্নোত্তর ও ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে আলোচনা	
সার-সংক্ষেপ			**১০ মিনিট**
	■ উদ্দেশ্য যাচাই ■ মূল বিষয়সমূহের পুনরালোচনা ■ হ্যাণ্ডআউট বিতরণ ■ পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ■ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হ্যাণ্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, মার্কার ফ্লিপচার্ট, ইত্যাদি

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ, খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তি

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহণ ঃ

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে কার্প জাতীয় মাছের রেণু ও চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল ও মাছের চারা পোনা পরিবহণ করা হয়ে থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা পোনা ও জুভেনাইল পরিবহণও অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহণকালে ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, এমন কি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহণকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সে কারণে সনাতন পদ্ধতিতে পোনা ও জুভেনাইল পরিবহণে অধিক সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

পোনা পরিবহণ ঘনত্ব ঃ

পরিবহণ ঘনত্ব মূলতঃ নির্ভর করে পিএল, জুভেনাইল ও চারা পোনার আকার, ওজন এবং পরিবহণ দূরত্বের ওপর। সাধারণ ভাবে ৩৬" X ২০" আকারের পলিথিন ব্যাগ পিএল বা পোনা পরিবহণে ব্যবহৃত হয়।

চিংড়ির পোনার আকার ও দুরত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিবহণ ঘনত্ব

সারণি ৯ঃ

পোনার আকার/ধরণ	পরিবহা ঘনত্ব/লিটার	পরিবহা সময় (ঘন্টা)	পরিবহা পদ্ধতি
পোষ্ট লার্ভা২০	৫০০-১০০০	১২-১৬	অক্সিজেনসহ পলি ব্যাগ
পোষ্ট লার্ভা৩০-৩৫	৩৫০-৫০০	৬	-ঐ-
জুভেনাইল (৫৭ সে:মি:)	১০-২০	৩-৬	-ঐ-

সারণি ১০ঃ কার্পের পোনার আকার ও দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিবহণ ঘনত্ব :

পোনার আকার (সে:মি:)	পরিবহণ ঘনত্ব/লিটার	পরিবহণ সময় (ঘন্টা)	পরিবহণ পদ্ধতি
৩	৩৩-৩৫	১০	অক্সিজেনসহ পলি ব্যাগ
৪	১৯-২০	১০-১২	-ঐ-
৫	১৩	১০-১২	-ঐ-
৬	৫	১০-১২	-ঐ-
৭	৪	১০-১২	-ঐ-
৩-৫	১৫	৩-৪	-ঐ-

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা খাপ খাওয়ানো এবং অবমুক্তি

পরিবেশের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে মজুদের পর মাছের পোনা এবং পিএল/জুভেনাইল ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করে নিলে এ মৃত্যু হার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহণ পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রায় সমতা আনয়নই হচ্ছে অভ্যস্তকরণ। নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত' করে পুকুরে পোনা বা পিএল/জুভেনাইল ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ-

- পরিবহণ পাত্র ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
  ব্যাগ বা পাত্রের মুখ খোলার পর আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল বদল করে দুই পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হবে।
- হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পরিবহণ পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে । লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২° সে এর বেশি না হয়।
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ, সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে। লক্ষণীয় যে পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায় পোনা ছাড়তে হবে, ঘের বা পুকুরের মাঝখানে নয়।

চিত্র ২৪ঃ পোনাসহ ব্যাগ ভাসিয়ে তাপমাত্রার সমতা আনা

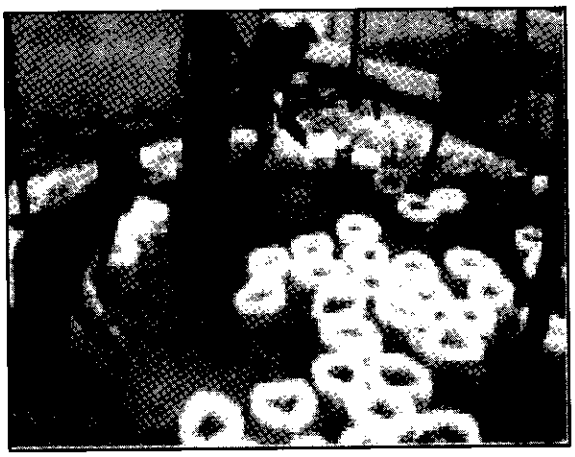

চিত্র ২৫ঃ নার্সারি পুকুরে পিএল মজুদের পূর্বে খাপখাওয়ানো

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা ছাড়ার সময়

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে পুকরে মাছের পোনা ছাড়া যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়াই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষতঃ নিম্নচাপের দিনে) পুকুর বা ঘেরে মাছের পোনা বা পিএল বা জুভেনাইল ছাড়া উচিত নয়।

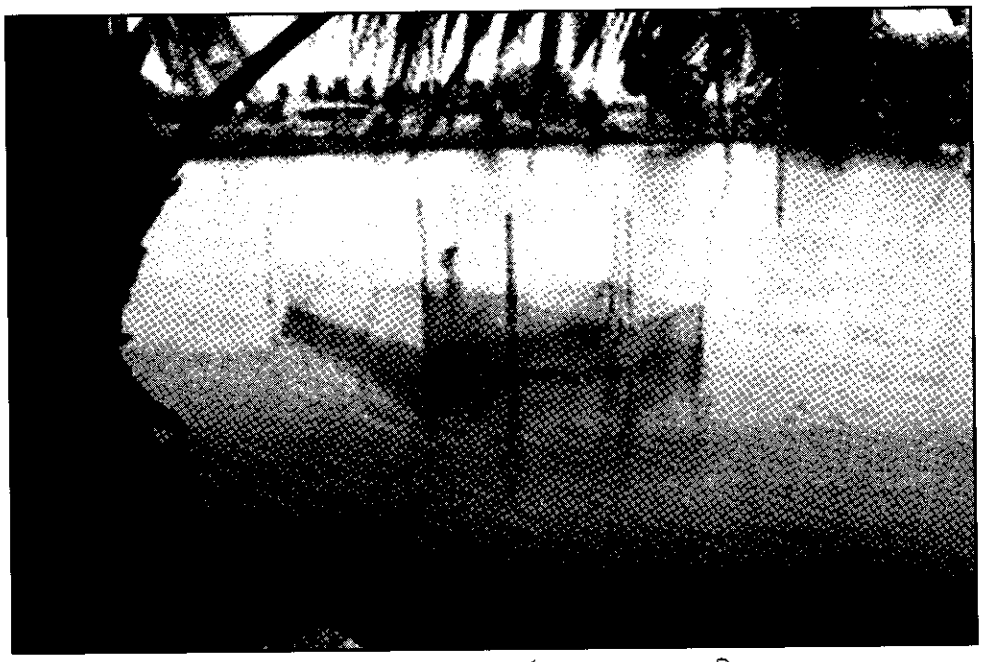

চিত্র ২৬ঃ পিএল মজুদের পূর্বে বেচে থাকার হার পরীক্ষা

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ৩ **সময় ঃ ১২.০০-১৩:৩০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ পানি ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের পানি ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হবে যাতে তারা তাদের ঘের বা পুকুরে সঠিকভাবে পানি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পানি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্পূরক খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা বলতে পারবেন।
- পানির উপযুক্ততা পরীক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৫ মিনিট**
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ • বর্তমান অধিবেশনের আলোকপাত • অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			**৭৫ মিনিট**
	• পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব • পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলী সংরক্ষণ পদ্ধতি • সম্পূরক খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় • সম্পূরক খাদ্য তৈরী ও প্রয়োগ এবং সতর্কতা	প্রশ্নোত্তর ও ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে আলোচনা ছোট দলীয় অনুশীলন	
সার-সংক্ষেপ			**১০ মিনিট**
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যাণ্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর ও ফ্লিপচার্ট	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী **ঃ হ্যাণ্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, মার্কার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি**			

পানি ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

পানি ব্যবস্থাপনা বলতে খামারের পানির ক্ষতিকর গুণাবলী সহনীয় মাত্রায় রাখা এবং পানি যেন চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর না হয় এ জাতীয় ব্যবস্থাপনা বুঝায়।

পানির গুণাগুণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কিছু ভৌত ও রাসায়নিক প্রভাব সমূহ ঃ

(ক) ভৌত গুণাবলীসমূহ ঃ

১) পানির গভীরতা ঃ পানির গভীরতা কম বা বেশি হলে পানির গুণাগুণ হঠাৎ পরিবর্তন হতে পারে। পানির গভীরতা কম হলে (১ মিটারের নিচে) রৌদ্রে তলা পর্যন্ত পানি গরম হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পানির পিএইচ, তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি কমে যায়। পানির ঘোলাত্ব বেড়ে যায়। এতে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ প্রবনতা কমে যায়, দূর্বল হয় এবং মারা যায়। পানির গভীরতা বেড়ে গেলে অতিরিক্ত পানি গেট দিয়ে বের করে দিতে হবে।

২) তাপমাত্রা ঃ গলদা চিংড়ির সুস্থ থাকার জন্য পানির তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকা ভাল। পানির তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেঃ এর নিচে নামলে চিংড়ির খাদ্য খাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। আবার অত্যধিক গরমে ৩৩ ডিগী সেঃ এর ওপর তাপমাত্রায় চিংড়ির পীড়ন শুরু হয় এবং ৩৫০ সেন্টিগ্রেড এর অধিক তাপমাত্রায় চিংড়ি মারা যেতে পারে।

৩) পানির স্বচ্ছতাঃ পানির স্বচ্ছতা নির্ভর করে পলিমাটি কণা এবং প্ল্যাংটন কণার ঘনত্ব ও দুষনের ঘনত্বের ওপর । খামারের পানির প্ল্যাংটনের পরিমাণ বেড়ে গেলে পানি পরিবর্তন ও কমে গেলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার দিতে হবে। সেকি ডিস্ক রিডিং অবশ্যই ২৫-৩৫ সে.মি. এর মধ্যে থাকতে হবে।

(খ) রাসায়নিক গুণাবলী সমূহ ঃ

(১) পি,এইচ- পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সূচক পিএইচ পানির উৎপাদন ক্ষমতা নির্দেশ করে। গলদা চিংড়ি খামারের পানির পিএইচ ৭.৫- ৮.৫ থাকা ভাল। পিএইচ ৪.৫ এর কম হলে চিংড়ির পীড়ন হয় এবং মৃত্যু হার বেড়ে যায়। কম পিএইচ এর ফলে চিংড়ির খোলস নরম হয় এবং খোলস বদল করতে পারে না। পিএইচ এর মান কাংক্ষিত মাত্রার কমবেশি হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা কমে যায়। পিএইচ কম হলে চিংড়ির রং কালো হতে পারে, অঙ্গহানি হতে পারে। পিএইচ কম হলে খামারের প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্ল্যাংকটনের উৎপাদন ব্যাঘাত ঘটে ও মারা যায়। সাধারণতঃ পোড়াচুন প্রয়োগের মাধ্যমে পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। অতি বর্ষণ পানির পিএইচ কমে যাওয়ায় চিংড়ির মৃত্যু হতে পারে। এ অবস্থায় প্রতি শতকে পোড়া চুন ৮০-১০০ গ্রাম বা ডলোমাইট ১৬০-২০০ গ্রাম ব্যবহার করতে হবে।

(২) **ক্ষারত্ব ও খরতা ঃ** পানিতে ক্ষার (কার্বনেট ও বাইকার্বনেট) এর ঘনত্ব হলো ক্ষারত্ব। আর ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব হচ্ছে খরতা, যা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ দিয়ে। গলদা চাষের উপযোগী ক্ষারত্ব ও খরতার মান হলো ৮০-২০০ মিঃ গ্রা/ লিটার। নিয়মিত চুন প্রয়োগে ক্ষারত্ব ও খরতা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(৩) **দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ** গলদা চিংড়ি খামারে ৪-৮ পিপিএম দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা ভাল, কমপক্ষে ৩ পিপিএম থাকা উচিত। দিনের বেলায় জলজ উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ কণা প্রচুর অক্সিজেন তৈরী করে আর তারা রাত্রের বেলা উক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে। রাত্রে জলজ উদ্ভিদ কণা, জলজ উদ্ভিদ ও পঁচনশীল পদার্থের অক্সিজেন গ্রহণের ফলে শেষ রাত্রে অক্সিজেন ঘাটতি চরমে উঠে। তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং তলার পঁচা কাদা জমতে দেয়া উচিত নয়।

(৪) **অ্যামোনিয়া ঃ** অ্যামোনিয়া উপস্থিতির জন্য পানি দূষিত হয়। বেশি পিএইচ এবং তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া অধিক বিষাক্ত। তলদেশে জৈব পদার্থের পঁচন, অব্যবহৃত খাদ্য ও জলজ আগাছার পঁচন এবং জলজ প্রাণীর মলমূত্র ত্যাগের ফলে অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পায়। পানিতে মুক্ত অ্যামোনিয়া ০.১ পিপিএম এর কম থাকাই বাঞ্চনীয়। বেশি হলে চিংড়ির স্বাস্থ্যহানি, বৃদ্ধিহানি এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। পানি পরিবর্তন ও চুন প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়া মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(৫) **হাইড্রোজেন সালফাইড ঃ** খামারের তলদেশের মাটিতে যদি পঁচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মাটিতে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস আছে। এ গ্যাস খুবই ক্ষতিকর। এর সামান্যতম উপস্থিতিতে চিংড়ি মারা যেতে থাকে। খামার প্রস্তুত করার সময়ে কালো কাদা অপসারণ করে, শুকিয়ে তলদেশ ধৌত করে এবং চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পরিবর্তন করে হাইড্রোজেন সালফাইড এর আধিক্য রোধ করা যায়।

সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

মাছ ও চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি এবং অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে সব বাড়তি খাবার দেয়া হয় এদেরকে সম্পূরক খাবার বলে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ির খাদ্যেও নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে এ সব পুষ্টি উপাদানের কোনটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় না থাকলে মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যে মাছ ও চিংড়ির সকল পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। মাছ ও চিংড়ির এ সকল চাহিদা পূরণের জন্য বাহির হতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের খাবার পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। আমাদের দেশে চাষিরা সাধারণত মাছ ও চিংড়ির জন্য যে সকল খাবার পুকুরে প্রয়োগ করে থাকেন উৎস অনুযায়ী সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-উদ্ভিদজাত- চালের পলিস কুঁড়া, গমের ভুষি, চালের খুদ, আটা, চিটাগুড়, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ক্ষুদিপানা, কুটি পানা, নরম ঘাস, শীতকালীনশাক-সবজি, বিচি কলার পাতা, আলুর পাতা, নেপিয়ার ঘাস ইত্যাদি। প্রাণীজাত- ফিসমিল, চিংড়ির মাথার গুড়া, কাঁকড়ার গুড়া, রেশম কীট, শামুকের মাংস, গবাদি পশুর রক্ত, হাঁস- মুরগীর নাড়ি, ভূড়ি ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

দৈহিক বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ ও চিংড়ি পুকুরের পরিবেশ থেকে প্রাণিকণা, উদ্ভিদকণা, তলদেশের পোকা-মাকড়, শুক কীট, ছোট ছোট কীটের লার্ভা, তলার কেঁচো, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে এ সব প্রাকৃতিক খাদ্য মাছ ও চিংড়ির প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদার যোগান দিতে পারে না। ফলে মাছ ও চিংড়ি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধির হার কমে যায়। যা সার্বিক উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা সৃষ্টির পাশাপাশি পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে চিংড়ির স্বজাতীভোজীতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পূরক খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। পুকুরের পরিবেশে যখন খাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন এদের স্বজাতিভোজীতা বৃদ্ধি পায় এবং সবল চিংড়ি দূর্বলগুলোকে ধরে খায় । এর ফলে ব্যাপক হারে চিংড়ি মারা যেতে পারে। পরিমিত পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ির এ ক্ষতিকর স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশের পুকুর-দীঘি ও উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরগুলোতে শতাংশ প্রতি মাছ চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন যথাক্রমে ৬ কেজি ও ২-২.৫ কেজি। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে এ সমস্ত জলাশয়ে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করে খুব সহজেই ৫ গুণের বেশি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। নিচে মাছ ও চিংড়ির চাষে সম্পূরক খাবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

- অধিক ঘনত্বে চিংড়ি চাষ করা যায়
- অল্প সময়ে চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়
- চিংড়ির মৃত্যু হার অনেকাংশে কমে যায়
- চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- চিংড়ির স্বজাতিভোজীতা রোধ করে
- অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়

খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

আমাদের দেশে চাষিরা সম্পূরক খাবার হিসেবে প্রধানত খৈল ও কুঁড়া ব্যবহার করে থাকেন। এ গুলো ছাড়াও প্রায় সারা দেশেই চাষিদের এমন কিছু খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায় যাদের কিছু কিছু আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, এমন কি কিছু কিছু পুকুরের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ ও চিংড়ি অধিক উৎপাদন। সে কারণে পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য নির্বাচনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। নিচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো–

- উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা
- চাষির আর্থিক সংগতি
- উপকরণসমূহের মূল্য
- মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা
- মাছ ও চিংড়ির পছন্দনীয়
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা

সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকা ও দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাদ্যেও সুষম খাবারের সবগুলো উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু এ সব খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। সে কারণে মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা বলতে সাধারণভাবে আমিষের চাহিদাকে বুঝানো হয়। মাছের খাদ্য তৈরিতে যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটিতে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যেমন শর্করা, চর্বি ও খণিজ লবণ বিদ্যমান থাকে। সে কারণে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা এদের বয়স ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে উৎপাদন চিংড়ির খাদ্যে আমিষের চাহিদা প্রায় ২৫-৩০%।

খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয়

আমাদের দেশে মাছ অথবা চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত কিছু প্রচলিত খাদ্য উপকরণের ওপর গবেষণা করে দেখাগেছে এদের মধ্যে উচ্চ মানের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের টেবিলে উল্লেখ করা হলো-

সারণি ১১ঃ

উপাদানের নাম	পুষ্টিমান (%)		
	আমিষ	শর্করা	স্নেহ
চালের কুঁড়া	১১.৮৮	৪৪.৪২	১০.৪৫
গমের ভূষি	১৪.৫৭	৬৬.৩৬	৪.৪৩
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৩৮	১৩.৪৪
তিলের খৈল	২৭.২০	৩৪.৯৭	১৩.১৮
ফিসমিল - এ গ্রেড	৫৬.৬১	৩.৭৪	১১.২২
ফিসমিল বি-গ্রেড	৪৪.৭৪	১৬.৮২	৭.৮৭
ব্লাড মিল	৬৩.১৫	১৫.৫৯	০.৫৬
আটা	১৭.৭৮	৭৫.৬০	৩.৯০
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	-
ক্ষুদিপানা	১৪.০২	৬০.৮৮	১.৯২
কুটিপানা	১৯.২৭	৫০.১৯	৩.৪৯

মাছ বা চিংড়ির খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয়ে শুধুমাত্র আমিষের মাত্রা হিসেব করা হয়। সাধারণ ঐকিক নিয়মে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি খাদ্যের পুষ্টিমান সহজেই নিরূপণ করা যায়। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে খাদ্যে আমিষের মাত্রা নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো। ধরা যাক ফিশমিল, সরিষার খৈল, গমের ভূষি এবং বাইন্ডার হিসেবে আটা ব্যবহার করে ১ কেজি খাদ্য তৈরি করা হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অনুপাত হবে ফিসমিল ২৫%, সরিষার খৈল ২৫%, গমের ভূষি ৪০% এবং আটা ১০%। তাহলে এ সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে তৈরি খাদ্যে আমিষের মাত্রা হবে-

সারণি ১২ঃ

উপকরণ	বিদ্যমান আমিষের পরিমাণ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (গ্রাম)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল	৫৬.৬১	২৫	২৫০	১৪.১৫
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	২৫	২৫০	৮.৩৩
গমের ভুষি	১৪.১৭	৪০	৪০০	৫.৮২
আটা	১৭.৭৮	১০	১০০	১.৭৮
খনিজ লবণ	-	-	১ চা চামচ	-
মোট		১০০	১০০০	৩০.০৮

অতএব, উল্লিখিত খাদ্যে আমিষের মাত্রা হচ্ছে ৩০.০৮%

খাদ্য তৈরিতে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাত ঃ

উপকরণ মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরির জন্য কম মূল্যের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে এদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্য প্রয়োগ বাবদ পুঁজি বিনিয়োগ কম হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত খাদ্য উপকরণ যেমন- খৈল, কুড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল, আটা, চিটাগুড় ইত্যাদি ব্যবহার করেই মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। নিচে চাষির আর্থিক সামর্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য তৈরিতে উপকরণ ব্যবহারের নমুনা উল্লেখ করা হলো-

সারণি ১৩ ঃ

উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য
ফিসমিল	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	৩০	৩০০
হাড়/ঝিনুকের গুড়া	-	-	৫	৫০
পলিস কুড়া/গমের ভুষি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
ভিটামিন প্রিমিক্স	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

মিশ্র খাদ্য ছাড়াও পুকুরে যদি গ্রাসকার্প ও সরপুটি থাকে তবে নিয়মিত ক্ষুদিপানা, কুটি পানা, নরম ঘাস, বিচি কলার পাতা, আলুর পাতা, নেপিয়ার ঘাস, শীতকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি দিতে হবে। গ্রাসকার্প প্রতি দিন এর দেহ ওজনের প্রায় ৪০-৪৫% পর্যন্ত সবুজ খাদ্য খেতে পারে।

খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা

মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার নির্ভর করে মূলতঃ পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। বড় মাছ ও চিংড়ির চেয়ে ছোট অবস্থায় এদের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশি। সে কারণে উৎপাদন পুকুরে প্রথম দিকে বেশি মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাছ ও চিংড়ি বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগ হার কমে গেলেও মোট খাদ্যের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেড়ে যায় । নিচের সারণিতে উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনায় মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা উল্লেখ করা হলো-

- জুভেনাইল মজুদ করা হলে মাছ ও চিংড়ির দেহ ওজনের ১০-৫% (খৈল, কুঁড়া, ফিসমিল জাতীয় খাবার)
- পিএল মজুদ করা হলে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্টার্টার ফিড
- ৪ সপ্তাহ পর থেকে খৈল, কুঁড়া, ফিসমিল জাতীয় খাবার মাছ ও চিংড়ির দেহ ওজনের ১০-৫%

স্টার্টার ফিডের সুপারিশকৃত মাত্রা

১ম সপ্তাহ ২০ গ্রাম/১০০০ পিএল, ২য় সপ্তাহ ৪০ গ্রাম/১০০০ পিএল, ৩য় সপ্তাহ ৬০ গ্রাম/১০০০ পিএল, ৪র্থ সপ্তাহ ৮০ গ্রাম/১০০০ পিএল

সম্পূরক খাদ্য তৈরি

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরি করা যায়। চাষি নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে মিনসিং মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

- খৈল কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিতে হবে
- চালের কুঁড়া, ভুষি ও ফিসমিল ভালভাবে চালুনি দ্বারা চেলে নিতে হবে
- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সিদ্ধ করে নিতে হবে
- সমস্ত উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে
- আটা পরিমাণ মত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরী করতে হবে
- উপকরণগুলো আঁঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাঁই তৈরী করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

মাছ দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। অপর দিকে গলদা চিংড়ি নিশাচর। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহণ করতে পছন্দ করে। সে জন্যে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে খাবারকে আবার দু'ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা পাটকাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে এক ফুট ওপরে খাদ্যদানি স্থাপন করতে হবে।

সবুজ খাদ্য প্রয়োগ

গ্রাস কার্প ও সরপুঁটির খাদ্য বাঁশ বা অন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমে (Feeding ring)'র মধ্যে দেয়া ভাল। ফ্রেমটি পাড়ের ১-২ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। ৩০ শতাংশ পুকুরের জন্যে ফ্রেমের সাধারণ মাপ হচ্ছে ১ বর্গ মিটার। পাতা জাতীয় উদ্ভিদ টুকরো টুকরো করে ফ্রেমের মধ্যে দিতে হয়। খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার খাদ্য দিতে হবে।

চিত্র ২৭ঃ খামার এলাকায়
ক. খাদ্য তৈরির যন্ত্র, খ. পিলেট মেশিন ও
গ. খাদ্য শুকানো এবং ঘ. সংরক্ষণ

খাদ্যদানি

খাদ্যদানি (ট্রে) তে খাবার দিলে খরচ বাঁচে এবং খাদ্যের ব্যবহার যথার্থ হয়। তা ছাড়া খাদ্যের পরিমাপ করাও সহজ হয়। পুকুরে কতটা খাদ্য দেয়া হবে এবং খাদ্য গ্রহণের প্রবনতা খাদ্যদানিতে পরীক্ষা করা হয়।

চিত্র ২৮ঃ খাদ্যদানিতে খাদ্য পরীক্ষা

খাদ্যদানি তৈরি

এটির আকার ১ বর্গ মিটার অথবা ৮০ x ৮০ সেঃ মিঃ হতে পারে। পিভিসি বা কাঠের ফ্রেমের নিচে মশারীর কাপড় লাগিয়ে ধর্ম জালের মতো করে তা তৈরি করা যায়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সেঃ মিঃ রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ পুকুরে ২টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬ টি খাদ্যদানি স্থাপন করলেই চলে। খাদ্যদানি ব্যবহার করা হলে তা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- মাঝে মাঝে খাদ্যদানি উঠিয়ে খাবার গ্রহণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক প্রয়োগমাত্রা পুনরায় নির্ধারণ করতে হবে
- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- রোগাক্রান্ত হলে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে না এবং পানির দূষন হলেও চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে না তাই ঐ সময় খাদ্য প্রয়োগ বন্দ রাখতে হবে।
- যখন চিংড়ি খোলস পরিবর্তন করে ঐ সময়ও চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে না।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ৩ **সময় ঃ ১৪:৩০-১৬:০০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণ, সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার এবং নমুনায়ন

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণ, সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার এবং নমুনায়ন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হবে যাতে তারা ঘের/পুকুরে সঠিকভাবে ও দক্ষতার সাথে প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণ ও সাধারণ সমস্যা সমূহ দূর করতে পারেন এবং সুষ্ঠুভাবে খামার ব্যবস্থাপনা করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পকে বলতে পারবেন।
- মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের মাত্রা ও পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- পুকুর/গলদা ঘেরের সাধারণ সমস্যাসমূহ বলতে পারবেন।
- পুকুর/গলদা ঘেরের সাধারণ সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পুকুর/গলদা ঘেরের নমুনায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কিভাবে নমুনায়ন করতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয় সূচী	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
[illegible]			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা • উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা ও আলোচনা	
[illegible]			৭৫ মিনিট
	• প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব • মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের মাত্রা ও পদ্ধতি • সাধারণ সমস্যাসমূহ • সাধারণ সমস্যাসমূহের প্রতিকার • নমুনায়নের গুরুত্ব • নমুনায়ন করার পদ্ধতি	প্রশ্নোত্তর মুক্তচিন্তার ঝড়, ফ্লিপচার্ট দলীয় কাজ- ঘটনা বিশ্লেষণ	
[illegible]			১০ মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন		
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপ কার্ড, প্রকৃত বস্তু ইত্যাদি।			

প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন, সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার এবং নমুনায়ন

প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

জলজ পরিবেশ থেকে মাছ ও চিংড়ি নানা ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে । নিয়মিত সার প্রয়োগের মাধ্যমে পানিতে এ সমস্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা যায়। পোনা ছাড়ার পর পুকুরে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায় না। সে কারণে চিংড়ি চাষের পুকুর/ঘেরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। চিংড়ির পরিমিত খাদ্যের যোগান ছাড়াও জলজ পরিবেশের সাম্যাবস্থা ও জীব বৈচিত্র বজায় রাখার পাশাপাশি মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। সার প্রয়োগের ফলে পানিতে যে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয় এটাই মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক খাবার। প্রাকৃতিক খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্য পরিবর্তন হার বেশী হওয়ায় মাছ ও চিংড়ির অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়। সার প্রয়োগের ফলে উৎপন্ন প্রাকৃতিক খাদ্য পানির বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে। পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যে থাকার কারণে এদেরকে খাদ্যের জন্য তেমন প্রতিযোগিতা করতে হয় না। এ ছাড়াও যে সব প্রজাতির মাছ সম্পূরক খাদ্যের প্রতি খুব বেশি আগ্রহ দেখায় না সার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের খাদ্যের পর্যাপ্ততা সৃষ্টি করা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্যে সুষম খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন- শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খণিজ লবণ এবং অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড ও ফ্যাটি এসিড পরিমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এ জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণে মাছ ও চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, রোগ ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয় না। এ সব কারণে অল্প খরচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষে পুকুরে মজুদ পরবর্তী নিয়মিত পরিমিত সার প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

ক. প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন

চাষাবাদকালে পুকুরের পানির উপযোগী রং হচ্ছে হালকা সবুজ, হলুদাভ সবুজ বা বাদামী সবুজ। পুকুরের পানির এ সমস্ত রং ভাসমান উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণার উপস্থিতির কারণে হয়ে থাকে। ভাসমান উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণার ঘনত্বের আধিক্য বা স্বল্পতার কারণে পানির রং পরিবর্তিত হয় এবং একই পুকুরে বিভিন্ন সময়ে পানির রং এ তারতম্য দেখা যায়। সে জন্যে নিয়মিতভাবে পানিতে বিদ্যমান খাদ্যকণার আধিক্য বা স্বল্পতা পরীক্ষা করে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। পুকুরের পানিতে খাদ্যকণার আধিক্য বা প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষার প্রথম উপায় হচ্ছে চোখ দ্বারা পানির রং পর্যবেণ। সূর্যালোকিত দিনে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে খোলা চোখেই পানির রং পর্যবেক্ষণ করা যায়। যদি পানির রং হালকা সবুজ/হলুদাভ সবুজ/বাদামী সবুজ থাকে তবে প্রতিদিন বা সপ্তাহে অন্তত ২ বার হাত দ্বারা বা সেকিডিস্কের সাহায্যে পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ করতে হবে। সূর্যালোকিত দিনের সকাল ১০-১২ টায় কনুই পর্যন্ত হাত পানিতে ডুবানোর পর যদি হাতের তালু দেখা যায় বা সেকি ডিস্কের সবুজ রশি পর্যন্ত (৩০ সেঃমিঃ) ডুবানোর পর যদি থালার সাদা কালো অংশ দেখা যায় তবে পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের প্রয়োগ মাত্রা

উদ্ভিদকণার বৃদ্ধির জন্য দু'টি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি হচ্ছে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস যাদের সহজপ্রাপ্য উৎস হচ্ছে জৈব ও রাসায়নিক সার। এ কারণে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে নিয়মিতভাবে জৈব সার এবং ইউরিয়া ও টিএসপি প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়। পুকুরে দৈনিক মাত্রায় মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ করাই উত্তম। বিভিন্ন কারণে সারের প্রয়োগ মাত্রা পুকুর থেকে পুকুরে কম-বেশি হতে পারে।

নিচের টেবিলে শতাংশ প্রতি দৈনিক মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের নমুনা মাত্রা দেখানো হলো-

সারণি ১৪ঃ

সারের নাম	প্রয়োগমাত্রা (প্রতি শতাংশে)
কম্পোস্ট (জৈব)	২৫০ -৩০০গ্রাম
ইউরিয়া	৩-৪ গ্রাম
টিএসপি	১.৫ -২ গ্রাম

যদি দৈনিক কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তাহলে দৈনিক মাত্রাকে ৭ দ্বারা গুণ করে সাপ্তাহিক মাত্রা বের করে প্রয়োগ করতে হবে। তবে একত্রে বেশি সার প্রয়োগ না করে প্রতিদিন অল্প মাত্রায় সার প্রয়োগে প্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদন অভিষ্ট মাত্রায় রাখা যায়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কম্পোস্ট ও টিএসপি সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২- ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে জৈব সার ও টিএসপি মিশ্রিত পানির সাথে ইউরিয়া খুব ভালভাবে মিশিয়ে সূর্যালোকিত দিনের সকাল ১০-১১ টায় পুকুরের চারিদিকে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। জৈব সার হিসাবে চিটাখড়, পিলেট, ফিসমিল, খৈল, ইষ্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় । প্রাণীর বিষ্টা চিংড়ি চাষি পরিহার করতে হবে কারণ এতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

সার প্রয়োগের সতর্কতা

- পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সার প্রয়োগ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হবে
- মেঘলা দিনে বা নিম্ন চাপের সময় সার প্রয়োগ অবশ্যই পরিহার করতে হবে
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়
- ঘোলা ও অম্লীয় পানিতে সারের কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে
- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পানিতে ভালভাবে গুলে নিতে হবে
- রোদ্রউজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে সার প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

খ. সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক এবং লাভজনক উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভাল ব্যবস্থাপনার পরও চাষকালীন সময়ে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে বেশ কিছু কারিগরি সমস্যা দেখা দিতে পারে যার কারণে ব্যাপক হারে উৎপাদনে বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরের এরূপ কিছু সাধারণ কারিগরি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১.রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছের প্রবেশ

পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় পুকুর/ ঘেরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ থেকে যেতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পানির সাথে বা বাচ্চাদের দ্বারা যে কোন সময় বাইরে থেকে শোল, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, চান্দা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। এতে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার

পাখি, জাল, বৃষ্টির পানির স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে এরা প্রবেশ করে। তাই এ সমস্ত উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে

- পুকুরে/ঘেরে বাইরের পানি ঢুকতে না দেয়া
- জাল ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন
- প্রয়োজনে পুকুরের চারদিকে ৩০-৪০ সেঃ মিঃ উঁচু বানা বা মশারী জালের বেড়া দেয়া
- মাঝে মাঝে জাল টেনে এ সমস্ত আগাছা অপসারণ করা।

২. পানির ওপর ঘন সবুজ স্তর

অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ মান বেড়ে যায়। এ ছাড়া শেওলা মরার পর পুকুরের তলায় জমা হয় এবং পঁচে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ ও চিংড়ি পানির উপরি স্তরে খাবি খায় এবং কখনও কখনও ব্যাপক হারে মারা যায়।

প্রতিকার

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে/ ঘেরে থেকে কিছু পানি বের করে পূণরায় উপযুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। সেই সাথে পুকুরে/ ঘেরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও কিছু সিলভার কার্পের চারা পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদকণার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিয়মিত পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা গেলে এ সমস্যা থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩. পানির ওপর লাল স্তর

অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্যে পানির উপর লাল স্তর পড়তে পারে। ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্যে পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক পুকুরে ইউগেলনা জাতীয় এককোষী প্রাণীয় জন্য এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিকার

ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি বানিয়ে পানির ওপর টেনে তুলে ফেলা যায়।

৪. অ্যামোনিয়া পুঞ্জীভবন

বিভিন্ন কারণে পুকুরের তলদেশে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চতর পিএইচ এ এমোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বেড়ে গেলে পানির পিএইচ দ্রুত ওপরে উঠে আসে। ফলে ব্যাপক সংখ্যায় মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। চিংড়ির ফুলকায় কালো দাগ পড়লে বুঝতে হবে নাইট্রোজেন বর্জ্য ও অন্যান্য রাসায়নিকের মাত্রা বেশি। অ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে রক্ত পরিবহণতন্ত্র দ্রুত আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার

মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা, সম্ভব হলে ৩০-৫০% পানি বদল ও পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ। অ্যামোনিয়ার মাত্রা কমিয়ে এনে পুনরায় খাবার দেয়া যায়। নিয়মিত পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা গেলে ভালো হয়। পানি আলোরিত করে (অর্থাৎ প্যাডেল হুইলার যা পাম্পের সাহায্যে পানি আলোরিত করা যায়) এ অবস্থার উন্নয়ন করা যায়।

৫. খাবি খাওয়া

অনেক পুকুরেই আগস্ট-সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল-মে মাসে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। সাধারণত ভোর রাতের দিকে মাছ পানির ওপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে এবং চিংড়ি পুকুরের কিনারায় উঠে আসে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে এটা ঘটে। অক্সিজেন স্বল্পতা যদি খুব বেশি ও দীর্ঘ মেয়াদী হয় তবে মাছ ও চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। সাধারণত পুকুরের তলায় অক্সিজেনের ঘাটতি হয়।

প্রতিকার

প্রাথমিক অবস্থায় সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রেখে পাম্প মেশিন বা প্যাডেল হুইলারের সাহায্যে পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়াতে হবে। পানি পরিবর্তন করে এ অবস্থায় উন্নয়ন করা যায়।

৬. রাক্ষুসে প্রাণীর উপদ্রব
সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া , উদ সরাসরি খেয়ে ফেলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

প্রতিকার
এ সমস্ত প্রাণী নিয়ন্ত্রণে কায়িক মাধ্যমই সবচেয়ে ভাল। সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ দেখার সাথে সাথেই মেরে ফেলতে হবে। উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভর্তি ডিমের খোসা পুকুরের পাড়ে রেখে দিলে উদের উৎপাত কমে যায়। বাঁশের চাঁই ব্যবহার করে সহজেই কাঁকড়া মারা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙ যে সমস্ত অঞ্চলে ডিম দেয় যেমন-পানি ও পাড়ের সংযোগ স্থলের ঘাস দূর করে ফেলতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত পুকুরের আশেপাশে জঙ্গল থাকে সেখানেই এসব প্রাণীর উপদ্রব বেশি হয় বলে চারপাশ আগাছা-জঙ্গল মুক্ত রাখতে হবে। পুকুরেরর পাড়ে ঘন ফাঁসের পুরাতন জাল দিয়ে বেড়া দেয়া যেতে পারে।

৭. অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ
দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। প্রায় সব চাষিই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করে। এলাকার ফলে এ সব খাদ্যের একটা বড় অংশ তলায় জমা হয়ে পানির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। এতে চাষ এলাকার মাটি দূষন হয় এবং মাছ ও চিংড়ি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার
প্রয়োগের পূর্বে খাদ্যের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য প্রয়োগ স্থানের মাটিতে জমে থাকা অতিরিক্ত কাদা অপসারণ করতে হবে। খাদ্য গ্রহণের মাত্রা ও গ্রহণ প্রবনতা যাচাই না করে খাদ্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. ঘোলাত্ব
বৃষ্টি ধোয়া পানিতে পুকুর ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। এর ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়। এ ছাড়াও মাছের ফুলকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার
বৃষ্টি ধোয়া পানির প্রবেশ রোধ করার জন্য সমতল ভূমি থেকে পুকুরের পাড় উঁচু রাখতে হবে। ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি শতাংশ পানিতে ১ কেজি করে পোড়া চুন বা জিপসাম ২ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৯. তলার কালো কাদা
অতিরিক্ত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় জমা হয়ে তলার মাটি কালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাষ করা পুকুরে/ঘেরে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। এর ফলে বিষাক্ত গ্যাস তলায় জমা হয়ে মাছ ও চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়ার সম্ভবাবনা থাকে। এ ছাড়াও চিংড়ির দেহ কালো হয়ে বাজার মূল্য হ্রাস করে এবং চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার
পুকুর প্রস্তুতির সময় তলার অতিরিক্ত কালো (প্যারী) কাদা তুলে ফেলতে হবে এবং চাষ এলাকার তলা ভালো করে শুকাতে হবে, চাষকালীন সময়ে চিংড়ির মড়ক দেখা দিলে দ্রুত পানি বদল, মজুদ ঘনত্ব হ্রাস করতে হবে প্রয়োজনে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

১০. স্বজাতিভোজীতা
চিংড়ি চাষের এটি একটি বড় সমস্যা। স্বভাবগত কারণে চিংড়ি স্বজাতিভূক প্রাণী। যখন এদের খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এরা ছোট ও দুর্বল আকৃতির গুলোকে ধরে খায়।

প্রতিকার
মজুদকালীন সময়ে পুকুরে সমান আকৃতির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। এ ছাড়াও নিয়মিত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে পুকুরে খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে। চাষ এলাকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ আশ্রয়স্থল (Substrum) দিতে হবে।

১১. বৃষ্টির পর ভেসে উঠা
বৃষ্টির পর অনেক সময় মাছ ও চিংড়ি পানির ওপর ভেসে খাবি খেতে পারে। পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ও পিএইচ কমে যাওয়ার ফলে এটা ঘটে থাকে। পিএইচ কমে গেলে ক্ষতিকর হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষক্রিয়া বেড়ে যায়। এ সময় ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন অক্সিজেন ছাড়ে না তাই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার
বৃষ্টির পরপরই পানির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে। প্রতিবার ভারী বৃষ্টির পর শতাংশ প্রতি ৭৫-৮০ গ্রাম হারে পোড়া চুন/ডলোমাইট প্রয়োগ করতে হবে। পানি যন্ত্রের সহায্যে আলোরিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২. অমাবশ্যা/পূর্ণিমায় চিংড়ির পাড়ে চলে আসা
অমাবশ্যা/পূর্ণিমার তিথিতে রাতের বেলায় চিংড়ি পাড়ের ওপর চলে আসতে পারে। ফলে শিয়াল বা অন্য কোন নিশাচর রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার
অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় অতিরিক্ত সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। তবে পুকুরের পানির পরিবেশ ভাল থাকলে এ অবস্থা দেখা যায় না। পাড় ঘেষে মশারীর জাল দিয়ে বেড়া প্রদান করা যেতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ৩ **সময় ঃ ১২:৩০-১২:২০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ গলদা চিংড়ির সাধারণ রোগ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের গলদা চিংড়ির সাধারণ রোগ ও তার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হবে যাতে তারা তাদের ঘের বা খামারে গলদা চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- গলদা চিংড়ির রোগের কারণসমূহ বলতে পারবেন।
- রোগাক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণসমূহ বলতে পারবেন।
- চিংড়ি রোগের প্রতিকার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- চিংড়ি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৭৫ মিনিট
	• গলদা চিংড়ির রোগের কারণসমূহ • রোগাক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণসমূহ • চিংড়ি রোগের প্রতিকার • চিংড়ি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ	ফ্লিপচার্ট, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা, হ্যাণ্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ হ্যাণ্ডআউট, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, প্রকৃত বস্তু ইত্যাদি

গলদা চিংড়ির সাধারণ রোগ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় চিংড়ির মাঝেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক চাষির পুকুরে ব্যাপক আকারে চিংড়ি মারা যায়, চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দেশ লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হয়।

রোগের কারণ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ-জীবাণু এবং চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ত যে সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি-(পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি)
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব
- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ও হ্যান্ডেলিং
- পুকুরের তলায় অতিরিক্ত পঁচা জৈব পদার্থ ও বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি
- পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ

রোগের সাধারণ লক্ষণ

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণের ধরন অনুযায়ী রোগাক্রান্ত চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

চিত্র ২৯ : সন্তরণ পদ খসে পড়া

রোগাক্রান্ত চিংড়ি

- ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করে না
- [illegible]
- [illegible] থাকে
- [illegible] পাড়ে উঠে আসে
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] হয়ে যায়

[illegible]

[illegible] ব্যাপার। ভাইরাস রোগের কোন চিকিৎসা নাই তবে ব্যাকটেরীয়া সংক্রামণে [illegible] রোগের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। কারণ রোগ সনাক্তকরণ ও [illegible] সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে চিকিৎসা বা রোগের [illegible] সাধারণ রোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

চিত্র ৩০ : মাথায় পানি জমা

লক্ষণ

মজুদের ৩-৪ মাস পর এন্টেনা, সন্তরণপদ খণ্ডিত অথবা ঝড়ে পড়তে থাকে।

প্রতিকার

- সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ।
- সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন।
- পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ডলোমাইট প্রয়োগ।

২.খোলস শক্ত হয়ে যাওয়া

কারণ

পরিবেশগত: পিএইচ, লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায়।

- অপুষ্টির কারণে খোলস পাল্টায় না
- খোলসে পরজীবের সংক্রামণ।

লক্ষণ

- খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত।
- বয়সের তুলনায় চিংড়ির কম দৈহিক বৃদ্ধি।

প্রতিকার

- পানির পরিবেশ উন্নয়ন।
- পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ।
- পানি আলোরিত করা এবং জাল টেনে দেয়া।

৩. ক্যারাপেস ও শরীরের ওপর শেওলা ও ঝিনুক জাতীয় পরজীবের সংক্রামণ

কারণ

পরিবেশগত যে কোন প্যারামিটারের তারতম্যের কারণে এটা হয়ে থাকে। পানিতে ফাইটোপ্লঙ্কটনের ঘনত্ব কম থাকা এবং আলো পুকুরের তল দেশ পর্যন্ত পৌছা। চাষ এলাকার পানির গভীরতা কম থাকার কারণেও এ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

লক্ষণ

করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধূসর রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুক বা শেওলা দেখা যায়।

প্রতিকার

- পুকুরের পানি পরিবর্তন।
- সার প্রয়োগে পানি ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- পানির গভীরতা ১ মিটার রাখা।
- পানির সরবরাহ বৃদ্ধি।

৪. নরম খোলস বা স্পঞ্জের মত দেহ

- চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই
- গলদা চিংড়ির মাঝে এ রোগ দেখা দেয়।

কারণ

- পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া।
- অ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া।
- পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।
- অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা, পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়া।
- চাষ এলাকায় তলার মাটি দূষণ।
- ব্যাকটেরিয়ায় সাংক্রামণ।

লক্ষণ

- খোলস নরম হয়ে যায়।
- পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়।
- দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়।

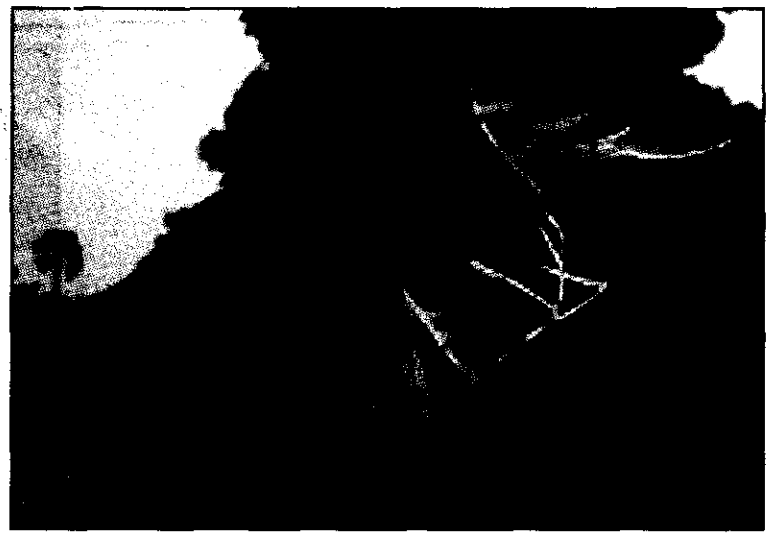

চিত্র ৩১ ঃ এন্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া

প্রতিকার

- পুকুরে প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর শতাংশ ২৫০ গ্রাম হারে কৃষি চুন বা ডলোমাইট প্রয়োগ।
- খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি। ক্যালসিয়াম বৃদ্ধির জন্য শামুক/ ঝিনুকের গুড়া প্রতি কেজি সম্পূরক খাদ্যের সংগে ৫% হারে ব্যবহার করা যেতে পারে। খাদ্যে ক্যালসিয়াম টেবলেট ব্যবহার করা যায়। পানির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও পানি পরিবর্তন।

৫. খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যু

কারণ

- খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন এবং খণিজ দ্রব্যের অভাব।
- পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কম থাকা ও জৈব পদার্থের আধিক্য
- মাটির দূষণ।

চিত্র ৩২ ঃ রোগাক্রান্ত গলদা চিংড়ি

লক্ষণ

- খোলস নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়।
- মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে।
  উল্লেখ্য যে সুস্থ চিংড়ি রান্না করলে রং লাল হয়।
  খোলসের অংশবিশেষ গায়ে লেগে থাকা, অন্য চিংড়ি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

প্রতিকার

- খাদ্যের সংগে ৫০ মিলি গ্রাম/কেজি হারে ভিটামিন প্রি-মিক্স(এমবাভিট-জি) প্রয়োগ।
- পানি পরিবর্তন।
- নিয়মিত ও পরিমিত চুন ও সার প্রয়োগ।
- আশ্রয়স্থল সঠিকভাবে স্থাপন।

চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আমাদের দেশের চাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে চিংড়ির রোগ নিরাময় চাষিদের পক্ষে শুধু কষ্ট সাধ্যই নয়; অনেকটা অসম্ভব ও বটে। সে কারণে মনে রাখা দরকার রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই অধিক শ্রেয়। চাষের শুরুতেই নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে চিংড়ির রোগ চিকিৎসার মত বিরক্তিকর বিষয় পরিহার করা যেতে পারে–

- পুকুরে পরিমিত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা
- পুকুর শুকিয়ে নিয়মিত চুন দেয়া
- যে কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত জুভেনাইল মজুদ না করা
- বাইরের অবাঞ্চিত প্রাণী ও পানি পুকুরে ঢুকতে না দেয়া
- তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা
- পরিমিত সার, চূন ও খাদ্য সরবরাহ করা
- পুকুরে ঘন ঘন জাল না ফেলা
- পুকুরে ঘোলাত্ব সৃষ্টির উৎস বন্ধ করা

চিত্র ৩৩ ঃ রোগাক্রান্ত গলদা চিংড়ি

চিত্র ৩৪ঃ চাষ এলাকার তলদেশ নষ্ট হবার কারণে সৃষ্ট রোগ

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ৪ **সময় ঃ ১২:০০ - ১৩:৩০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা, গ্রেডিং ও বিপণন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা, গ্রেডিং ও বিপণন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হবে যাতে তারা তাদের মাছ ও চিংড়ি সঠিকভাবে আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা করে বাজারজাত করতে এবং মাছ/চিংড়ি চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সকল তথ্য ও রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- আহরণযোগ্য মাছ ও চিংড়ির আকার ও ওজন বলতে পারবেন।
- মাছ ও চিংড়ি চাষের ঋতু ভিত্তিক ঝুঁকি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আহরণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাজারজাতকরণ বলতে পারবেন।
- রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কিভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
	▪ স্বাগতম ▪ পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ▪ বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত। ▪ উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
	▪ আহরণযোগ্য মাছ ও চিংড়ির আকার ও ওজন ▪ মাছ ও চিংড়ি চাষের ঋতু ভিত্তিক ঝুঁকি ▪ আহরণ পদ্ধতি ▪ বাজারজাতকরণ ▪ রেকর্ড সংরক্ষণ গলদা কার্প মিশ্রচাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব	প্রশ্নোত্তর, ফ্লিপচার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা	
	▪ মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা ▪ উদ্দেশ্য যাচাই ▪ হ্যাণ্ডআউট বিতরণ ▪ পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ▪ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	

আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা, গ্রেডিং, বাজারজাতকরণ এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

খাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে পুকুর হতে মাছ ও চিংড়ি ধরাই হচ্ছে আহরণ। লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ অপরিহার্য। পুকুর হতে দু'ভাবে চিংড়ি আহরণ করা যায়। যেমন- ১.আংশিক আহরণ ২.সম্পূর্ণ আহরণ। প্রত্যেক পুকুরের একটি নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা থাকে। ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে সে পুকুরে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন হার কমে আসে। অথচ পুকুরে তখনও সার ও খাদ্য প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। পুকুরের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি বড় মাছ ও চিংড়িগুলো ধরে ফেলা হয় তবে বাকিগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে সার্বিক উৎপাদনও বেশি হয়। সে কারণে সুযোগ থাকলে মাছ ও চিংড়ির আংশিক আহরণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়াও আংশিক আহরণে চুরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক কমে যায় এবং সময় মত বিক্রি করে ভাল বাজার মূল্যও পাওয়া যায়। তবে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে কোন পদ্ধতিতেই আহরণ করা হোক না কেন মাছ ও চিংড়ি আহরণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে:

- মাছ ও চিংড়ির আকার এবং ওজন
- মাছ ও চিংড়ির মোট জীবভর
- বাজার মূল্য
- ঝুঁকি
- পুনঃমজুদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা

আকার ও ওজন

স্বভাবগত ভাবে মাছ ও চিংড়ি ঝাঁকে চলার কারণে এক সাথে সবার বৃদ্ধি সমান হয় না। তাই অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভের জন্যে বড় মাছ ও চিংড়িগুলোকে আহরণ করে ছোটগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেয়া উচিত। এ জন্যে যখনই মাছ ও চিংড়ি নিম্নে উল্লেখিত ওজন বিশিষ্ট হয় তখনই আহরণ করা উচিত।

সারণি ১৫ : প্রজাতি ভিত্তিক আহরণযোগ্য ওজন

কাতলা	> ৫০০ গ্রাম	সিলভার	>৭ ৫০ গ্রাম
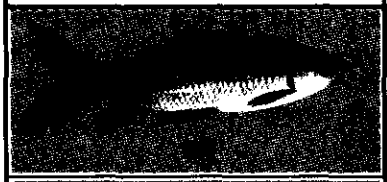	> ২৫০ গ্রাম		>৭ ৫০ গ্রাম
	> ১০০ গ্রাম		> ৭৫০গ্রাম
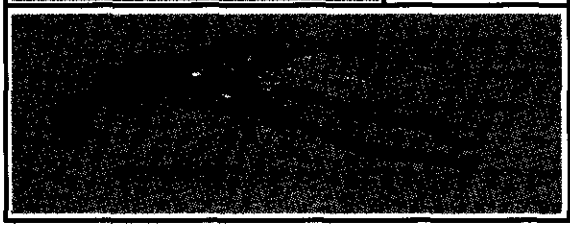			

জীবভর

জীবভর হলো পুকুরে মজুদকৃত সমস্ত মাছ ও চিংড়ির মোট ওজন। জীবভর শতাংশ প্রতি ৭.৫ কেজির বেশি রাখা উচিত নয়। এতে পুকুরের পানির পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হতে পারে, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। তাই যখনই জীবভর প্রতি শতাংশে ৭.৫ কিলোর বেশী হবে তখনই বড় মাছ ও চিংড়িগুলো আহরণ করা উচিত।

মাছ ও চিংড়ি চাষের ঋতু ভিত্তিক ঝুঁকি

মাছ ও চিংড়ি চাষে ঋতুভিত্তিক বেশ কিছু ঝুঁকি থাকে। এ সব ঝুঁকি মোকাবিলায় সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। এমন কি অনেক সময় সমস্ত চাষ ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ঝুঁকিগুলো হচ্ছে-

১.বর্ষাকালীন ঝুঁকি

বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি বা বন্যায় সমস্ত মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে। তাই এ সময়ের আগেই বড় অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

২. শুষ্ক মৌসুমের ঝুঁকি

শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যেতে পারে বা পানির গভীরতা কমে যেতে পারে। এ অবস্থায় পানি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ফলে সমস্ত মাছ ও চিংড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই বাজারজাতযোগ্য মাছ ও চিংড়ি ধরে ফেলা উচিত।

৩. শীতকালীন ঝুঁকি

এ সময়ে পুকুরে জীবভর বেশি থাকলে রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সে কারণে শীতের আগেই বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে পুকুরের জীবভর কমিয়ে দেয়া উচিত। শীতের আগে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে গলদা চিংড়ি সম্পূর্ণ আহরণ করা উচিৎ কারণ শীতকালে চিংড়ি কম খাদ্য গ্রহণ করে এবং চিংড়ির বৃদ্ধি হয় না।

চুরি

এটা একটা সাধারণ সামাজিক ঝুঁকি। পুকুরে মাছ ও চিংড়ি বড় হলে এ ঝুঁকি বেড়ে যায়। সে কারণে বড় মাছ ও চিংড়ি আহরণ করলে চুরির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

বাজার দর

চিংড়ি চাষের সাথে আর্থিক লাভের একটি সম্পর্ক রয়েছে, তাই আহরণের সময়ের সাথে মাছ ও চিংড়ির দামের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজার দর বিভিন্ন এলাকায় ও ঋতুতে কম বেশি হয়ে থাকে। লাভজনক দামের প্রতি খেয়াল রেখেই মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

এ ছাড়াও চিংড়ি আহরণে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হয়। যেমন-

নমুনায়নের সময় যদি দেখা যায় হাটার বড় পায়ের চিমটার ওপরের অংশ নীল বা কালো রংয়ের হয়ে গেছে তাহলে চিংড়ির আর দৈহিক বৃদ্ধি হবে না। ফলে পুকুর থেকে এ সব চিংড়ি তুলে ফেলাই লাভজনক। সাধারণত পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে বড় হয়ে থাকে। সে কারণে অধিকাংশ চাষিরাই তাদের পুকুরে পুরুষ চিংড়ির মজুদ রাখতে আগ্রহ দেখায়। এ ক্ষেত্রে নমুনায়ন বা আংশিক আহরণের সময় পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ি তুলে ফেলে পুরুষ চিংড়ি পুনঃমজুদ করা যায়। উল্লেখ্য যে চিংড়ির ওজন ১০-১৫ গ্রাম হলে স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায়।

চিংড়ি আহরণের আগে চাষির প্রস্তুতি ও আহরণকালীন সাবধানতা

- উপযুক্ত পরিবহণ যানসহ চিংড়ির ক্রেতা পূর্বেই নির্ধারিত রাখা
- ভোর রাতে চিংড়ি ধরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ধৃত চিংড়ি ভালভাবে ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির সরবরাহ রাখা
- অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় এবং তারপর দু'দিন গলদা চিংড়ি না ধরা, এ সময় বেশির ভাগ গলদা চিংড়ির খোলস নরম থাকে
- ধরার সময় চিংড়ি যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় সে জন্য যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা
- চিংড়ি ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য খামারে উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করা
- মাটি, ঘাস, বাঁশের ঝুড়ি ও চাটাই, হোগলার পাটি, পাটের চট ইত্যাদির ওপর চিংড়ি না রেখে মসৃণ পাকা প্লাষ্টিক সিটের ওপর রাখা
- বরফ পানি চিংড়ি রেখে চিংড়ি দেহ ঠান্ডা করে ১ঃ২ আনুপাতিক হারে চিংড়ি ও বরফ দিয়ে পরিবহণ করতে হয়, তাই আহরণের আগে প্রয়োজনীয় বরফ সংগ্রহ করতে হবে।

মাছ আহরণ পদ্ধতি

পুকুর বা জলাশয়ের আয়তন এবং মাছ আহরণের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেই আহরণের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। মাছ আহরণ পদ্ধতি সাধারণতঃ তিন ধরনের-

১. বেড় জাল পদ্ধতি , ২. ঝাঁকি জাল পদ্ধতি, ৩. ট্র্যাপ (ঘূর্ণি, দুয়াড় ইত্যাদি) পদ্ধতি ও ৪. পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি

১. বেড় জাল পদ্ধতি

যদি পুকুর আয়তনে বড় হয় এবং বেশি পরিমাণে মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে বেড় জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেড় জালের ফাঁসের আকার ১/২ ইঞ্চি হওয়া উচিত। জাল উচ্চতায় পানির গভীরতার দ্বিগুণ এবং লম্বায় পুকুরের দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে দেড়গুণ হওয়া উচিত। একই পুকুরে একই দিনে দু'বারের বেশি জাল টানা উচিত নয়। এতে মাছ ও চিংড়ির উপর চাপ পড়ে এবং ছোট মাছ ও চিংড়িগুলো আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যেতে পারে। জাল টানার পর যথা শীঘ্র বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে ছোটগুলো ছেড়ে দেয়া উচিত।

চিত্র ৩৫ ঃ চিংড়ি আহরণ

২. ঝাঁকি জাল পদ্ধতি

যদি স্বল্প পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে ঝাঁকি জালই উত্তম। মাছ ও চিংড়ি ধরার ২০-২৫ মিনিট আগে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থানে ৩-৫ টি খাদ্য বল দিলে এদের ধরা সহজ হবে।

৩. ট্র্যাপ পদ্ধতিঃ

ঘূর্ণি, দুয়াড় ধোছনা ইত্যাদি পেতে রেখে চিংড়ি আহরণ ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

৪. পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি

চিংড়ির আহরণের জন্য এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করে আহরণ করা হয়।

আহরণের সময়

ঠান্ডা এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছ ও চিংড়ি ধরা উচিত। বিশেষ করে ভোর বেলা মাছ ও চিংড়ি ধরার উত্তম সময়। এ ছাড়াও স্থানীয় বাজারের সময়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সারণি ১৬ ঃ গলদা চিংড়ির গ্রেডিং

মাথা সহ		মাথা ছাড়া	
গ্রেড	প্রতি কেজিতে সংখ্যা	গ্রেড	প্রতি ৫০০গ্রামে সংখ্যা
৫	৫ পর্যন্ত	৫	৫ পর্যন্ত
১০	৬ - ১০	৮	৬ - ৮
২০	১১ - ২০	১২	৯ - ১২
৩০	২১ - ৩০	২০	১৩ - ২০
৫০	৩১ - ৫০	৩০	২১ - ৩০

মাছ ও গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ

মাছ ও চিংড়ি বাজারজাতকরণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো উৎপাদিত/আহরণকৃত মাছ ও চিংড়ির গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখা। এ লক্ষ্যে যা যা করণীয় অর্থাৎ আহরণের সময় কাল থেকে শুরু করে বরফ দেয়া, স্বাস্থ্যকর পাত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা অতীব জরুরি। বিশেষত: চিংড়ি বাজারজাতকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

চিংড়ি বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহণ পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবহণ বাক্সে বা পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ দিয়ে তার ওপর এক স্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বরফ ও চিংড়ি সাজানোর পরে সবার উপরে পুরু করে এক স্তর বরফ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানোর সময়

খেয়াল রাখা উচিত যেন পাত্রে ২ ফুট এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানা না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ির দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশংকা থাকে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত চিংড়ির কোন সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠে নাই। ফলে চিংড়ি চাষী ও ক্রেতাদের মধ্যে বহু মধ্যবর্তী লোক চিংড়ি বিপণনের সাথে জড়িত। এসব মধ্যস্বত্বভোগীদের চিংড়ির ন্যায় একটি মূল্যবান সম্পদ সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে কোন জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময়ে উৎপাদিত পণ্য বিপণনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য বিপণনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে মানসম্মত বিপণন ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। সাথে সাথে চিংড়ি এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বরফ কল ও অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি।

আহরণের পর চিংড়ি টাট্‌কা রাখার জন্য করণীয় কাজ

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বা কোন চালের নিচে ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পাকা জায়গা অথবা প্লাস্টিক সিটের ওপর রাখা যাতে চিংড়ির গায়ে কোন ময়লা, ঘাসের টুকরা ইত্যাদি লাগতে না পারে।
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়ি ভালভাবে ধুয়ে বরফ পানিতে শীতল করা।
- পরিষ্কার চিংড়ি বরফ/ঠাণ্ডা পানির ট্যাংকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা যাতে করে চিংড়ির শরীরের সব জায়গা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

চিংড়ি পরিবহণকালীন বিবেচ্য বিষয়

- বরফের পানিতে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাস্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাক বা ভ্যানে পরিবহণ করা।
- দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও তাপের মধ্যে খোলা নৌকা, ভ্যানগাড়ী, রিকশা বা সাইকেলে চিংড়ি পরিবহণ না করা।
- সব সময় চিংড়ির বাক্স ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা।
- পরিবহণে কত সময় লাগবে তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের। অনুপাত ১:২ হয়। দিনের তাপমাত্রাও এ ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়।
- পরিবহণের সময় চিংড়িতে যেন তাপ না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।
- প্যাকিং সামগ্রী হিসাবে বাঁশের ঝুড়ি, হোগলা পাটি, চট ও কলা পাতা ব্যবহার না করা। এ ক্ষেত্রে ফুড গ্রেডেড প্লাষ্টিকের বাস্কেট ব্যবহার করতে হবে।
- ধরার পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌঁছানো।
- পরিবহণের পর পরিবহণ যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

চিত্র ৩৬ ঃ পোনা সংগ্রহ

রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক চাষির একটি করে রেকর্ড বই থাকা একান্তই দরকার। এই রেকর্ড বইয়ে চাষির নাম, ঠিকানা, পুকুরের অবস্থা, আয়তন ও বৈশিষ্ট, চুন, সার শত্রু প্রাণী বিনষ্টকারী বিষ প্রয়োগের মাত্রা, মজুতকৃত প্রদান সংখ্যা, আকার, মজুদের তারিখ, চাষকালীন সার ও খাদ্য প্রয়োগের তারিখ ও মাত্রা, ক্রয়মূল্য ও চিংড়ি ও মাছের শারিরীক বৃদ্ধির হার, আহরণ, চিংড়ি চাষির মজুদ ব্যয়ের বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব তথ্য মৎস্য সম্প্রসারণকারীকে দেখালে তিনি আগামী মৌসুমে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চিংড়ির উৎপাদন, গুণগতমান এবং লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন। এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করে না রাখলে কারো পক্ষেই চিংড়ি চাষিকে ভাল উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

এছাড়া প্রতিদিন বা সপ্তাহ বা পাক্ষিক যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে।

সারণি ১৭ ঃ আমাদের যে সমস্ত রেকর্ড রাখা প্রয়োজন

সময়	কার্যক্রম
ক) প্রতিদিন	পানির রং পানির গভীরতা সেকী রিডিং'র তাপমাত্রা খাদ্য প্রয়োগ আর্থিক তথ্য ইত্যাদি।
খ) প্রতি সপ্তাহে	পানির গুণাগুণ, চিংড়ি স্বাস্থ্য পরীক্ষা (খাদ্য গ্রহণ, রোগ, চলাচল ইত্যাদি), সার প্রয়োগ ও প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ।
গ) পাক্ষিক	চূন প্রয়োগ, চিংড়ির বৃদ্ধি, মজুদ ঘনত্ব, খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ।
ঘ) মাসিক	আয়-ব্যয়ের হিসাব, মজুদ পর্যবেক্ষণ, মালামালের মজুদ সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
ঙ) বার্ষিক	আয়-ব্যয়ের হিসাব, সংগৃহীত তথ্যাদি চূড়ান্ত করণ, পরিচালনা প্রণয়ন ইত্যাদি।

গলদা খামার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সাধারণ তথ্য

ক. ১ পুকুর নং ঃ .....

ক. ২ পুকুরের আয়তন ঃ .....

ক. ৩ পরিচালনাকারীর নাম ঃ .....

চাষ ব্যবস্থাপনা

খ.১ সার ব্যবস্থাপনা ঃ ..... পরিকল্পনা করা হয়েছে / করা হয়নি

খ.২ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ ..... পরিকল্পনা করা হয়েছে / করা হয়নি

খ.৩ আহরণ ব্যবস্থাপনা ঃ ..... পরিকল্পনা করা হয়েছে / করা হয়নি

খ.৪ পরিচালনার বাজেট ঃ ..... পরিকল্পনা করা হয়েছে / করা হয়নি

খ. ৪.১ প্রস্তুতকালীন ব্যয় ঃ ..... পরিকল্পনা করা হয়েছে / করা হয়নি

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
	মোট				

খ.৪.২ মজুদকালীন ব্যয়

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১					

খ.৪.৩ মজুদ পরবর্তী ব্যয়

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১					

খ.৪.৪ আহরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১					

মোট ব্যায় (খ.৪.১+খ ৪.২+খ.৪.৩+৪.৪)=.....টাকা

খ.৪.৬ আহরণ (আয়)

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১					

নীট আয়ঃ

মোট আয়-মোট ব্যয় ঃ টাকা

প্রতি শতাংশে ব্যয়ঃ টাকা

প্রতি শতাংশে নীট আয় ঃ টাকা

গলদা চিংড়ি খামারে মজুদ পূর্ব ও মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজ ও তার বিবরণ			সম্ভাব্য তারিখ/সময়
১.	পাড় মেরামত ও তলা সমানকরণ-কায়িক শ্রম			
২.	পাড় পরিস্কার ও আগাছা দূরীকরণ, তলার কালো কাদা অপসারণ-কায়িক শ্রম			
৩.	রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ-রোটেন প্রয়োগ/চা বীজের খৈল প্রয়োগ মাত্রা .....গ্রাম/শতাংশ/ফুট মোট প্রয়োজনীয় পরিমাণ .....কেজি			
৪.	চুন প্রয়োগ- প্রয়োগ মাত্রা ..... কেজি/শতাংশ মোট প্রয়োজনীয় পরিমাণ .....কেজি			
৫.	মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ			
	প্রজাতি	আকার	ঘনত্ব/শতাংশ	মোট
৬	পিএল চুক্তি			
৭	সার প্রয়োগ	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ	মোট পরিমাণ	
	বাসায়নিক জৈব			
৮	প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ			
৯	আশ্রয়স্থল স্থাপন			
১০	পিএল পরিবহণ			
১১	খাপ খাওয়ানো ও ছাড়া			

গলদা চিংড়ি খামার মজুদ পূর্ব ও মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজ ও ভার বিবরণ			সম্ভাব্য তারিখ/সময়
১.	পিএল বেঁচে থাকার হার পর্যবেক্ষ			
২.	সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ			
	খাদ্য উপকরণ	শতাংশ প্রতি প্রয়োগমাত্রা/দিন	মোট পরিমাণ/দিন	
	কুঁড়া			
	ভূষি			
	খৈল			
	ফিসমিল			
	নিলেট			
৩.	প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ			
	ঘনত্ব/শতাংশ			মোট
৪.	সার প্রয়োগ	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ		মোট পরিমাণ
	টিএসপি			
৫	তথ্য সংরক্ষণ			
৬	হররা টানা			
৭	আহরণ			
	প্রজাতি	সংখ্যা		
৮	আয়-ব্যয়ের হিসাব চুড়ান্তকরণ			
৯	পরবর্তী বৎসরের পরিকল্পনা প্রণয়ন			

পুকুর পরিচালনা কাজের নমূনা সময় বিন্যাস (নমুনা)

প্রাত্যহিক কাজ

প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ
সার প্রয়োগ (মজুদ পরবর্তী)
পিএল এর আচরণ পর্যবেক্ষণ
খাদ্য ট্রে পরীক্ষা

সাপ্তাহিক কাজ

তথ্য সংরক্ষণ
প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পাক্ষিক কাজ

প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন
জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা
হররা টানা
চুন ও সার প্রয়োগ

মাসিক কাজ

নমুনানয়ন
অনিয়মিত কাজ (মজুদ পূর্ব)
আগাছা দমন
পাড় মেরামত, তলার কালো কাদা অপসারণ
রাক্ষুসে মাছ দুরীকরণ
চুন প্রয়োগ
সার প্রয়োগ
প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা
পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা
চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন

অনিয়মিত কাজ (মজুদকালীন)

পিএল পরিবহণ, খাপ খাওয়ানো ও ছাড়া

অনিয়মিত কাজ (মজুদ পরবর্তী)

আহরণ
বাজারজাতকরণ
আয়-ব্যয়ের হিসাব চুড়ান্তকরণ

১.০০ একর পুকুরে কার্প-গলদা চিংড়ি চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব (নমুনা)

ব্যয়ের হিসাবঃ

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত ও কাজের বিবরণ	ব্যয়ের টাকা
১.	পুকুর সংস্কার (পাড় মেরামত, তলার কাঁদা উত্তোলন	৫০০.০০
২.	আগাছা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ	৮০০.০০
৩.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ২০০ কেজি চুন ক্রয়	১,৬০০.০০
৪.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ৪০০০ কেজি কম্পোষ্ট সার ক্রয় বাবদ	২,০০০.০০
৫.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ইউরিয়া ১৩০ কেজি	৭৮০.০০
৬.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে টিএসপি ৭০ কেজি	৯৮০.০০
৭.	জুভেনাইল ক্রয় ৩৫০০টি	১৭,৫০০.০০
৮.	রুইজাতীয় মাছের পোনা(৭-১০ সে.মি) ক্রয় ২৫০০টি	৫,০০০.০০
৯.	বিভিন্ন প্রকারের মোট ২০০০ কেজি সম্পূরক খাদ্য ক্রয় বাবদ	২০,০০০.০০
১০.	মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ	২৫,০০০.০০
১১.	পুকুর বেষ্টনী নির্মাণের জন্য নেট ক্রয় বাবদ	১,০০০.০০
১২.	বিবিধ	৩৪০.০০
	সর্বমোট	৭৫,৫০০.০০

(পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)

আয়ের হিসাবঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাত ও বিবরণ	আয়ের পরিমাণ (টাকা)
১.	মাছ উৎপাদন-১৫৭৫.০০ কেজি	৯৪,৫০০.০০
২.	গলদা চিংড়ি উৎপাদন ২০২ কেজি	৮০,৮০০.০০
	সর্বমোট	১,৭৫,৩০০.০০

(এক লক্ষ পঁচাত্তোর হাজার তিনশত টাকা মাত্র)

মোট আয়= ১,৭৫,৩০০.০০
মোট ব্যয়= ৭৫,৫০০.০০

নীট লাভ = ৯৯,৮০০.০০
(নিরানব্বই হাজার আটশত টাকা মাত্র)

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ৪ **সময় ঃ ১৪:৩০-১৫:৩০** **মেয়াদকাল ঃ ১ ঘন্টা**

অভীষ্ট দল ঃ গলদা চিংড়ি চাষি

শিরোনাম ঃ গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস ও চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস ও চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতি-মালা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হ্যাসাপ ও হ্যাসাপ নীতিমালা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- চাষ ক্ষেত্রে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয় সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত। • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস • হ্যাসাপ ও হ্যাসাপ নীতিমালা • চাষ ক্ষেত্রে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন • মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনে ফ্লো চার্ট তৈরী • চাষে সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ড এনালিসিস • হ্যাসাপ প্লান তৈরি	প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা	
সার-সংক্ষেপ			৭ মিনিট
	• মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ *হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট,*

গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা ভাল চাষ অনুশীলন ও চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন

গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা ভাল চাষ অনুশীলন

খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগত মান ও নিরাপত্তার বিষয়টি চাষি, বিক্রেতা, প্রক্রিয়াকরণকারী বা রপ্তানিকারক এবং বিদেশি ক্রেতা, কারোরই একক দায়িত্ব নয়। গুণগত মান এবং নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক উৎপাদন থেকে শুরু করে বিদেশি ক্রেতার নিকট রপ্তানি করা পর্যন্ত স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে কম-বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। চিংড়ি চাষ, চিংড়ি ধরা, প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিপণন, পরিবহণ, রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিদেশী ক্রেতার নিকট প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিকরণ সকল ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ যেমন প্রয়োজন তেমনি ধাপগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষি, বিক্রেতা এবং প্রক্রিয়াকরণকারীর মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা অপরিহার্য। কারণ চিংড়ির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই প্রক্রিয়াকরণকারীকে যেমন জানতে হবে চাষি চাষের ক্ষেত্রে "ভাল চাষ অনুশীলন" বা "গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস" মেনেছেন কিনা তেমনি তাকে এটিও জানতে হবে যে, বিক্রেতা "ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবস্থা" বা "গুড হাইজিন প্রাকটিসেস" অনুসরণ করে আহরণোত্তর পরিচর্য্যার কাজটি সম্পন্ন করেছেন কিনা। কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্য্যার উপর গুরুত্ব দিলেই চিংড়ির গুণগত মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান আদৌও সম্ভব নয়। আহরণোত্তর পরিচর্য্যার পাশাপাশি প্রয়োজন চাষ পর্যায়ে কঠোরভাবে "গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস" বা "ভাল চাষ অনুশীলন" অনুসরণ করে নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করা।

"গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস" আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি সংশ্লিষ্ট আইনের অংশ। আমাদের দেশে এটি এখনো বাধ্যতামূলক নয়, তবে পণ্যর মান উন্নয়নে এটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস এবং "হ্যাসাপ" ইন এ্যাকোয়াকালচার (চিংড়ি চাষ)

"হ্যাসাপ ইন এ্যাকোয়াকালচার" একটি পৃথক বিষয় হলেও গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা জানি "হ্যাসাপ" বা "হ্যাজার্ড এনালিসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট" পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের একটি আধুনিক পদ্ধতি। এটি একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক, যুক্তিসংগত, সুসংগঠিত, নিখুত এবং প্র-এ্যাক্টিভ পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে মান নিশ্চিতকরণে বহু বছর যাবৎ ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিহার করার অনিবার্য প্রয়োজনেই এই পদ্ধতির উদ্ভব। ষাটের দশকের শুরুতে মহাকাশ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী নভোচারীদের জন্য শতকরা একশত ভাগ ত্রুটিমুক্ত খাদ্য তৈরির জন্য এই পদ্ধতিকে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে এই পদ্ধতির বহুমাত্রিক ব্যবহার কার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে এটি একটি ইউনিভার্সাল পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে এ্যাকোয়াকাল্চারেও এটিকে সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু, এ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ (রেসিডিউ) এবং অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতির মত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিবেশী দেশগুলি চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজারে স্ব স্ব পণ্যের ভাবমূর্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সুবিধাজনক ও অগ্রগামি অবস্থানে আছে।

আমরা জানি হ্যাসাপ কোন বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি নয়, এটি বাস্তবায়নের জন্য মূল ভিত্তি হিসাবে প্রথমেই কিছু "পূর্বশর্ত কর্মসূচি" বা "প্রি-রিকুইজিট প্রোগ্রামস্" পূরণ করতে হয়, যেমন- "গুড ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসেস (GMP) " বা "স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউরস (SOP)" এবং "স্যানিটেশান স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউরস্ (SSOP) ", ইত্যাদি। একইভাবে চিংড়ির চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের জন্য "গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস" একটি পূর্বশর্ত। অর্থাৎ চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে আগে থেকেই সেখানে "গুড এ্যাকোয়াকাল্চার প্রাকটিসেস" বা "ভাল চাষ অনুশীলন" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে এভাবে বলা যায় যে, একটি গ্রহণযোগ্য মানের "গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস" বিদ্যমান না থাকলে খামারের স্যানিটেশানের অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন মানের হয় এবং এক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকির মাত্রাও বেশি থাকে। এই অবস্থায় খামারে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। পক্ষান্তরে, গুড এ্যাকোয়াকাল্চারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হলে খামারের স্যানিটেশানের উন্নয়ন ঘটে এবং তা একটি সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছায়। ফলশ্রুতিতে, খামারের নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং নিরাপত্তার একটি গ্রহণযোগ্য মান অর্জন করে ফলে সহজেই হ্যাসাপ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। সুতরাং চাষ পর্যায়ে "হ্যাসাপ পদ্ধতি" বাস্তবায়ন করতে হলে পূর্বেই সেখানে "গুড এ্যাকোয়াকাল্চার প্রাকটিস" এর প্রচলন করতে হবে।

গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ পদ্ধতি অনুশীলন

গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অনুশীলন চাষ পর্যায়ে অনুসরণীয় সেই সমস্ত কার্যাবলি যা সঠিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হলে পণ্য হিসেবে চিংড়ির গুণগত মান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার (ফুড সেফটি) বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়মগুলিকেই "গুড এ্যাকোয়াকাল্চার প্রাকটিস বা জিএপি" বলা হয়।

চাষ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও কার্যক্রমগুলির জন্য অনুসরণীয় গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অনুশীলন এর ধাপ সমূহ ঃ

১। খামারের অবস্থান ঃ চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচনের সময় চাষিকে সংশ্লিষ্ট জমির পূর্বের ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ জমির অতীত ব্যবহার মাটির রাসায়নিক চরিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিংড়ির খামারটি যদি এমন জমির উপর তৈরি করা হয় যেটি পূর্বে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, ঐ জমিতে বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের অবশেষ (রেসিডিউ) বিদ্যমান আছে। এসমস্ত ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ চিংড়ির বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং উৎপাদিত চিংড়িকে ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তোলে। একইভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পশু-পাখির বিচরণ, বা বায়ু-বাহিত দূষণের (যেমন- রাসায়নীয় স্প্রে) মত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আশ-পাশের পরিবেশও চিংড়ি খামারের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার, শিল্প ও কল-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পয়:বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইত্যাদির মত মারাত্মক উৎস সংলগ্ন স্থানে চিংড়ি খামার তৈরি করতে দেখা যায়। যদি কোন চিংড়ি খামার কৃষি ক্ষেত, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার, জনবসতি বা বস্তির সন্নিকটে অবস্থিত হয় ত'হলে চাষিকে চিংড়ি খামারের উপর স্থাপনাগুলির ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করে স্থান নির্বাচনের বিষয়টি স্থির করতে হবে। নিয়মিত কীটনাশক ও সার ব্যবহার করা হয় এ ধরণের নিবিড় কৃষি চাষ পদ্ধতি চিংড়ির বৃদ্ধিতে এবং চিংড়ির নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। রাসায়নিক দূষণে দূষিত পানিতে উৎপাদিত চিংড়ি ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

২। চাষে ব্যবহৃত পানি ঃ চিংড়ি খামারের পানির মান উৎপাদনাধীন চিংড়ির স্বাস্থ্য, গুণগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। দূষিত পানি যেমন চিংড়ি মৃত্যুর কারণ হয় তেমনি তা চিংড়ির বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দূষিত পানি উৎপাদিত চিংড়ির দেহে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা করে ও ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটায়। পানির উৎসটি দূষিত হলে খামারের পানিও দূষিত হবে। চিংড়ি খামারের স্থান নির্বাচনের সময় তাই ভাল পানির উৎসের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। পানি দূষণের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি প্রায়শই দেখা যায় সেগুলি হ'ল- ভারী ধাতুসমূহ (হেভি মেটালস), বিভিন্ন কীটনাশক এবং কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং কলিফর্ম ও স্যাল্‌মোনেলা জীবানু। ভারী ধাতুগুলির একাধিক উৎসের মধ্যে প্রকৃতিই এগুলির একটি সাধারণ উৎস। ভারী ধাতুসমূহের অন্যান্য উৎসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক উৎসটি হ'ল শিল্প কারখানার বর্জ্য। কৃষিতেও কিছু কিছু ভারী ধাতুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩। পার্শ্ববর্তি পরিবেশ ঃ চিংড়ি খামারের আশ পাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাল অবস্থায় রাখলে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক বিপদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায়। চাষ পর্যায়ে অনেক সময় ভূমি ক্ষয় বা ভূমি ধ্বস ঘটে থাকে যা চাষির জন্য সরাসরি আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়া ছাড়াও পানিতে রাসায়নিক ও জীবাণুর দূষণ ঘটায়। জলাশয়ের চারদিকে পরিকল্পিত উপায়ে গাছ লাগালে (যেমন-ম্যানগ্রোভ) ভূমিক্ষয় বা ভূমিধ্বস রোধ করার পাশাপাশি জলাশয়ে রাসায়নিক ও জীবাণু ঘটিত দূষণকেও রোধ করা যায়। এ ছাড়া জলাশয় এবং আশ-পাশ থেকে ঝোপ-ঝাড়, অতিরিক্ত জলজ আগাছা এবং ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলা জরুরি। চিংড়ি খামারে বন্য প্রাণীর বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ দুরহ ব্যাপার এবং এজন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা চাষীর জন্য বড় ধরণের চ্যালেঞ্জও বটে। ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি, ভোঁদড়, বিভিন্ন পাখী এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেলা, ই.কলি, ইত্যাদি) সংক্রমণের ঝুঁকিপুর্ণ উৎস্য হতে পারে। সরাসরি জলাশয়ে বা জলাশয়ের আশ পাশে অথবা চিংড়ির খাবার তৈরি বা সংরক্ষণ করা হয় এমন স্থানের নিকটে মল-মূত্র ত্যাগ করা হলে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেলা, ই.কলি, ইত্যাদি) পানিতে বা খাবারে মিশে পরিশেষে উৎপাদিত চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির এই সংক্রমণ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপের মধ্যদিয়ে বাহিত হয়ে ভোক্তার নিকট পৌছায় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী অনেকগুলি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বাহক এবং যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে এরা খুব সহজেই খাদ্যকে সংক্রমিত করতে পারে। খাদ্য তৈরি, প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ এলাকায় এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি।

৪। স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস/হাইজিন প্রাকটিস ঃ চিংড়ি খামারে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বলতে মূলত: মানুষের মল ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ বা পশু-পাখীর মল ও বর্জ্যের সার হিসেবে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। এ ক্ষেত্রে বিপদজনক বিষয়টি হ'ল এই যে, স্তন্যপায়ী বা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর বর্জ্য বা মল মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বহন করে যা চিংড়ির খামারে বিস্তার লাভ করতে পারে। চিংড়ি খামারে, বিশেষকরে জলাশয়ে এবং সংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস মেনে চললে পানিতে মল-মূত্রের দূষণকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। চিংড়ি খামারে কর্মরত লোকজনকে কোন অবস্থাতেই পুকুরের পানিতে, পাড়ে, পুকুর সংলগ্ন এলাকায়, পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন সব জলাশয়ে (যেমন- নদী ,

খাল, ইত্যাদি) মল-মূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবেনা। এছাড়া খামার সংলগ্ন এমন সব স্থানেও মল-মূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবেনা যেখান থেকে মল-মূত্র বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে পড়তে পারে। মল-মূত্র ত্যাগের জন্য খামার এবং পানির উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে জলাবদ্ধ পায়খানা (স্যানীটারী ল্যাট্রিন) তৈরী করতে হবে। পায়খানাগুলিকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে যেন মলাধার থেকে দূষিত তরল পদার্থ কোন ভাবেই জলাশয়ে চুইয়ে না পড়ে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ও উষ্ণ রক্তের প্রাণীর মলে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। এ জন্য পুকুরে অপরিশোধিত মল ও বিষ্ঠাকে সার হিসাবে ব্যবহার চিংড়ির গুণগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃস্টি করে। সংগত কারণেই তাই চিংড়ির পুকুরে উল্লেখিত উৎসের জৈব সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

৫। চিংড়ির খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতা ঃ চিংড়ি একটি দামি পণ্য হওয়ায় চাষ পর্যায়ে তার যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে চাষি খুবই সচেতন। তবে অধিক বৃদ্ধির প্রত্যাশায় চাষি অনেক সময় সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করেই খাবার ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে যেমন নিম্ন মানের খাবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তেমনি সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। নিম্ন মানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কেবল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয় তা ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকিও চাষ পর্যায়ে ব্যবহৃত খাদ্যে অগ্রহণযোগ্য বা ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা খাদ্যকে চিংড়ি এবং ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তুলতে পারে। চাষ পর্যায়ে চিংড়িকে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন কাঁচা খাবার, যেমন- শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরা মাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়ী-ভূড়ী, স্কুইড, কাঁকড়া চূর্ন, ইত্যাদি দেয়া হয়। এ ধরণের খাবার ব্যবহারে চাষীরা বেশী উৎসাহী, কারণ তাতে খরচ কম। কিন্তু, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের কাচা খাবার বিভিন্ন ধরণের রোগ-জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত থাকে, যেমন- স্যালমোনেলা, ভি.কলেরা, ই.কলি, ইত্যাদি এবং খাবারের মাধ্যমে তা খুব সহজেই চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। তাছাড়া এ ধরনের কাঁচা খাবার খুব সহজেই পানিকে দূষিত করে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণকে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে চিংড়ির ব্যাপক মড়কও দেখা দিতে পারে। তবে এ সমস্ত কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য রোগ-জীবাণু সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

৬। ঔষধের ব্যবহার ঃ প্রাণীকুলের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার হলেও এর অপব্যবহার আবার প্রাণীর জন্য মারত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে চাষ পর্যায়ে বিভিন্ন এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার চাষ ক্ষেত্রে চিংড়ির রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিশেষে চাষির জন্য বিপদ ডেকে আনে। অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘ ব্যবহার চিংড়ির দেহে এ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা করে এবং চিংড়ির মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চাষ পর্যায়ে অতীতে ব্যবহৃত কতিপয় এ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহে ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে সেগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া চাষ পর্যায়ে অনুমোদিত এ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও জারী করা হয়েছে। চাষ পর্যায়ে ঔষধের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার চাষির জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। চাষাধীন চিংড়ি, খামারে নিয়োজিত কর্মী, পরিবেশ এবং ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ, মাত্রা নির্ধারণ এবং এর অবশেষ নি:শেষের সময় (উইথড্রয়াল টাইম) মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পাশা পাশি স্টোরে ঔষধ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পর অবশিষ্টাংশ এবং খালি প্যাকেট বা পাত্র ফেলে দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। চাষ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঔষধের অনুমোদিত একক তালিকা প্রণয়ণ করা এখনো সম্ভব হয়নি; এক্ষেত্রে দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত চিংড়ি পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে, যেমন- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও অন্যান্য দেশ। তাই চাষ পর্যায়ে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দেশসমূহে তার অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য।

৭। চিংড়ির আহরণপূর্ব মূল্যায়ন ঃ চাষের সময় সাধারণত: প্রত্যেক চাষি নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিংড়ির আকার, পরিমাণ এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এটি এক ধরণের রুটিন চেক, যা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই প্রয়োজন। চাষ পর্যায়ে চিংড়ি ধরার আগে এই রুটিন চেক চিংড়ির গুণগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি মূল্যায়নের একটি বাড়তি সুযোগ তৈরী করে দেয়। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগত মান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার অবস্থা কাংখিত স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা চিংড়ি ধরার পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরী। এ জন্য চিংড়ি আহরণের ৭-১০ দিন আগে একটি আহরণ-পূর্ব পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা উচিৎ। কারণ, আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান এবং খাদ্য-নিরাপত্তা সম্পর্কিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তখন চাষী বা প্রক্রিয়াকরণকারীর পক্ষে আর তেমন কিছু করার সুযোগ থাকেনা। পক্ষান্তরে, আহরণ-পূর্ব পরীক্ষায় বা মূল্যায়নে ত্রুটি ধরা পড়লে পুকুরে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

৮। আহরণের সময় অনুসরনীয় ব্যবস্থাপনা ঃ খামারে চাষকৃত চিংড়ি আহরণের কাজটি এমন কতগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় যা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের গুণগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি হ'ল:

* খাবার কমিয়ে দেয়া/বন্ধ করে দেয়া।
* আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ এবং কর্মী প্রস্তুত রাখা।

* আহরণ
* হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ।

জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং গুণগত মান সংরক্ষণের জন্য উল্লেখিত ধাপগুলির নির্ধারিত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আহরণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য চাষির উচিত সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চিংড়ি আহরণের দিন-ক্ষণ ঠিক করা।

চিংড়ি ধরার কাজটি সাধারণতঃ নোংরা অবস্থায় হলেও চিংড়ি রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে। কারণ, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা ও পূর্বের মরা চিংড়ি থেকে নতুন চিংড়িতে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। চিংড়ি রাখা এবং পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত সকল বাস্কেট, টাব ও অন্যান্য পাত্রকে যথাযথভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণু মুক্ত করতে হবে। চিংড়ি ধরার কাজে যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে তাদেরকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অবস্থায় (রোগ মুক্ত) থাকতে হবে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে কোন কাটা ঘা বা দূষিত ক্ষত থাকবে না। ধরার পর সরাসরি হাত দিয়ে চিংড়ি হ্যান্ডলিং না করে দস্তানা (হ্যান্ড গ্লোভস্) পরে হ্যান্ডলিং করা সবচেয়ে ভাল।

৯। পরিচর্যা এবং পরিবহণের জন্য প্রস্তুতি ঃ পরিবহণের পূর্বে চিংড়িকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর পর থেকে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গুণগত মানের প্রকৃত অবনতি শুরু হয়। তাই প্রস্তুতির এই পর্যায়ে অনেক বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়। এ পর্যায়ে চাষিকে যা করতে হবে ঃ

* ইতোপূর্বে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত চিংড়িকে পানযোগ্য পানি দিয়ে তৈরি কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে। পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সের মধ্যে প্রথমে বরফের একটি স্তর, তারপর চিংড়ির একটি স্তর, তারপর আবার বরফ- এভাবে সাজাতে হবে।

* পরিবহণে কত সময় লাগবে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কত তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১:১ । দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

* পরিবহণের সময় চিংড়িতে যেন চাপ না লাগে সেজন্য উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সে চিংড়ি পরিবহণ করতে হবে। উপযুক্ত ডিজাইনের বাক্স উপর্যুপরি সাজিয়ে রাখলেও নিচের বাক্সের চিংড়িতে একটুও চাপ পড়বেনা। পক্ষান্তরে, বাস্কেটের উপর বাস্কেট রাখলে উপরের বাস্কেটের চাপে নিচের বাস্কেটের চিংড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

* ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাকে বা ভ্যানে করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চিংড়িকে ডিপো/ আড়তে/ সার্ভিস সেন্টারে/সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

* পরিবহণের পর পরিবহণ যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

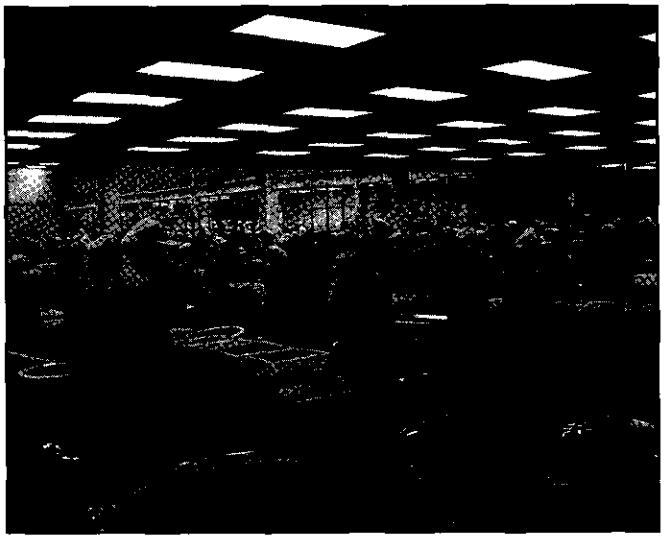

চিত্র ৩৭ঃ বরফ প্রাসেসিং করা হচ্ছে।

চিংড়ির আহরণোত্তর পরিচর্য্যার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপের ফলে সাধারণভাবে আমরা মনে করে থাকি যে, কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্য্যার উপরই চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভরশীল। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি মূলত: চাষের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি চাষের পরিবেশের সংগে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় চিংড়ি চাষে সফলতা অর্জন অনেকাংশেই চাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চাষ পর্যায়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের এই কাজটি গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস অনুসরনের মাধ্যমে অর্জন করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি একই সাথে চাষ পর্যায়ে "হ্যাসাপ নীতিমালা" বাস্তবায়ন সুগম হবে।

মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন

হ্যাসাপ কি ?

হ্যাসাপ "হ্যাজার্ড এনালিসিস্ ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট" এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি যে কোন খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোন খাদ্য পণ্যের কাঁচা মালের উৎসস্থল থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে এমনকি ঐ পণ্যটির সর্বশেষ ব্যবহারের পর্যায়ে ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিকর পদার্থিক, জীবগত এবং রাসায়নিক বিষয়গুলিকে(হ্যাজার্ড) চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত হ্যাজার্ডগুলিকে প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ধাপে সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ (নিয়ন্ত্রণ) ব্যবস্থা নেয়া হয়। এরপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির হ্যাজার্ড প্রতিরোধের সমতা এবং সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডগুলির দ্বারা বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনার নিরিখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন্ কোন্ ধাপ সঙ্কটপূর্ণ (ক্রিটিক্যাল) তা নির্ধারণ করে কেবলমাত্র ঐসমস্ত ধাপেই বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় স্থানেই নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে নিবিড় করার মাধ্যমে পণ্যের সর্বাধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

হ্যাসাপ এর গুরুত্ব

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত । বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির বিবেচনায় চিংড়ি এ খাতের মোট অবদানের সিংহ ভাগ দখল করে আছে। চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি শিল্প। প্রতি বছর এ শিল্প খাত থেকে আমরা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি। চিংড়িকে তাই বাংলাদেশের রুপালি সম্পদ বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের চিংড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

চিংড়িতে ক্ষতিকর জীবাণু, কীটনাশক, এন্টিবায়োটিক, হরমোন বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেলে তা বিষাক্ত বলে গণ্য করা হয়। আমদানিকারক দেশগুলি এরকম চিংড়ি গ্রহণ করে না। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত আমাদের চিংড়ির চাহিদা থাকলেও বিভিন্ন সময়ে এদেশ থেকে রপ্তানিকৃত চিংড়িতে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু, নোংরা ও ময়লা বস্তু এবং বিভিন্ন অপদ্রব্যের উপস্থিতির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের চিংড়িকে সাধারণত: নিম্ন মানের চিংড়ি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ কারণে প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় আমাদের দেশের চিংড়ির মূল্য কেজি প্রতি ১ থেকে ২ ডলার কম। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমস্ত কারণে বাংলাদেশের চিংড়ি নিম্ন মানে পর্যবসিত হয় তার বেশিরভাগেরই উৎস চিংড়ির চাষ ও আহরণোত্তর পরিচর্যার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত থেকে দেখা গেছে যে, চাষ পর্যায়ে রাসায়নিক ও জীবগত হ্যাজার্ড সংক্রমণের ব্যাপক এবং সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। আমাদের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ চাষ এবং পরিবেশের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইতোমধ্যেই আমরা এর প্রভাবও লক্ষ্য করছি। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মৎস্য পণ্যে এমনসব ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং অণুজীবের উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে যেগুলির প্রয়োগ এবং সংক্রমণ চাষ পর্যায়েই ঘটার সম্ভাবনা বেশি। এ প্রসংগে চিংড়িতে নাইট্রোফুরান ও কোরামফেনিকল নামক ক্ষতিকর এ্যান্টিবায়োটিক এবং টাইফয়েড ও কলেরার ন্যায় মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখিত ক্ষতিকর এ্যান্টিবায়োটিক ও জীবাণুর উপস্থিতির কারণে প্রতিবছর রপ্তানিকৃত বিপুল পরিমাণ চিংড়ি বিদেশ থেকে ফেরৎ আসছে। ফলে একদিকে রপ্তানিকারকগণ যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তেমনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটিকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে অনতিবিলম্বে মাছ ও চিংড়ির চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দ্যোগ নিতে হবে।

হ্যাসাপের মূলনীতি

হ্যাসাপ এর সকল কার্যক্রম সাতটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের সংগে সংগতি রেখে মূলনীতিগুলি উল্লেখ করা হলঃ

১। মাছ ও চিংড়ির খামারে সম্ভাব্য কি কি সমস্যা তৈরি হতে পারে তা চিহ্নিত করে ঐ সমস্যাগুলি মাছ ও চিংড়ির কি কি ক্ষতি করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা। একই সাথে সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।

২। মাছ ও চিংড়ি চাষের ধাপগুলির মধ্যে ঠিক কোন্ ধাপটিতে বা কোন্ কোন্ ধাপগুলিতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে চাষের সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নির্মূল হবে বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রশমিত হবে তা নির্ধারণ করা।

৩। সমস্যাগুলি নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রশমিত করার জন্য গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি ঠিক কিভাবে বা কোন্ মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করা।

৪। মূলনীতি ২ এ নির্ধারিত ধাপটিতে বা ধাপগুলিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলি নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রশমিত করার জন্য গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি যে ভাবে বা যে মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা আসলেই কার্যকর কিনা তা জানার জন্য পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

৫। মূলনীতি ৪ এ উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে যদি দেখা যায় যে আসলে সমস্যার সমাধান হয়নি তা হলে ঘটে যাওয়া সমস্যা সংশোধনের জন্য কি ব্যবস্থা নিতে হবে তা নির্ধারণ করা।

৬। মাছ ও চিংড়ি খামারের জন্য গৃহীত হ্যাসাপ পদ্ধতিটি চাষির সমস্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশাকে পূরণ করছে কিনা তার একটি সার্বিক যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

৭। মাছ ও চিংড়ি খামারের জন্য গৃহীত হ্যাসাপ পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের লিখিত প্রমাণ বা ডকুমেন্ট সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর।

মাছ ও চিংড়ি খামারে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত

যেকোন মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনের খামারে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রধান পূর্ব শর্ত হল "ভাল চাষ অনুশীলন" বা "গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস" মেনে চলা। উচ্চ গুণগত মানের মৎস্য ও চিংড়ি পণ্য উৎপাদনের জন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান মেনে যে চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তাকেই "ভাল চাষ অনুশীলন" বলা হয়। জাতীয়ভাবে আমাদের দেশে এধরনের বিধি-বিধান বা গাইড লাইন এখনো তৈরি করা সম্ভব না হলেও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য গাইড লাইন বা 'কোড অব কন্ডাক্ট' প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে জাতীয় গাইড লাইনের অনুপস্থিতিতে সেগুলি অনুসরন করা যেতে পারে।

মাছ ও চিংড়ি খামারে হ্যাসাপ বাস্তবায়ন

প্রথমে মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সকল হ্যাজার্ড এর এনালিসিস বা বিশ্লেষণ করতে হবে। হ্যাজার্ড এনালিসিস এর কার্যক্রমটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য চাষ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের একটি 'প্রবাহিক নকশা' বা 'ফ্লো ডায়াগ্রাম' তৈরি করতে হবে এবং বাস্তব অবস্থায় নকশাটিতে যে কোন ত্রুটি নেই তা যাচাই করে নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে ফ্লো ডায়াগ্রামে কোন ধাপ বাদ গেলে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের কাজটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। পরবর্তী কাজ হল মাছ ও চিংড়ি চাষের সকল পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে হ্যাসাপ-এর সাতটি মূলনীতির প্রয়োগ।

চিত্র ৩৮ ঃ একটি আদর্শ গলদা চিংড়ি খামার

মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের ফ্লো চার্ট

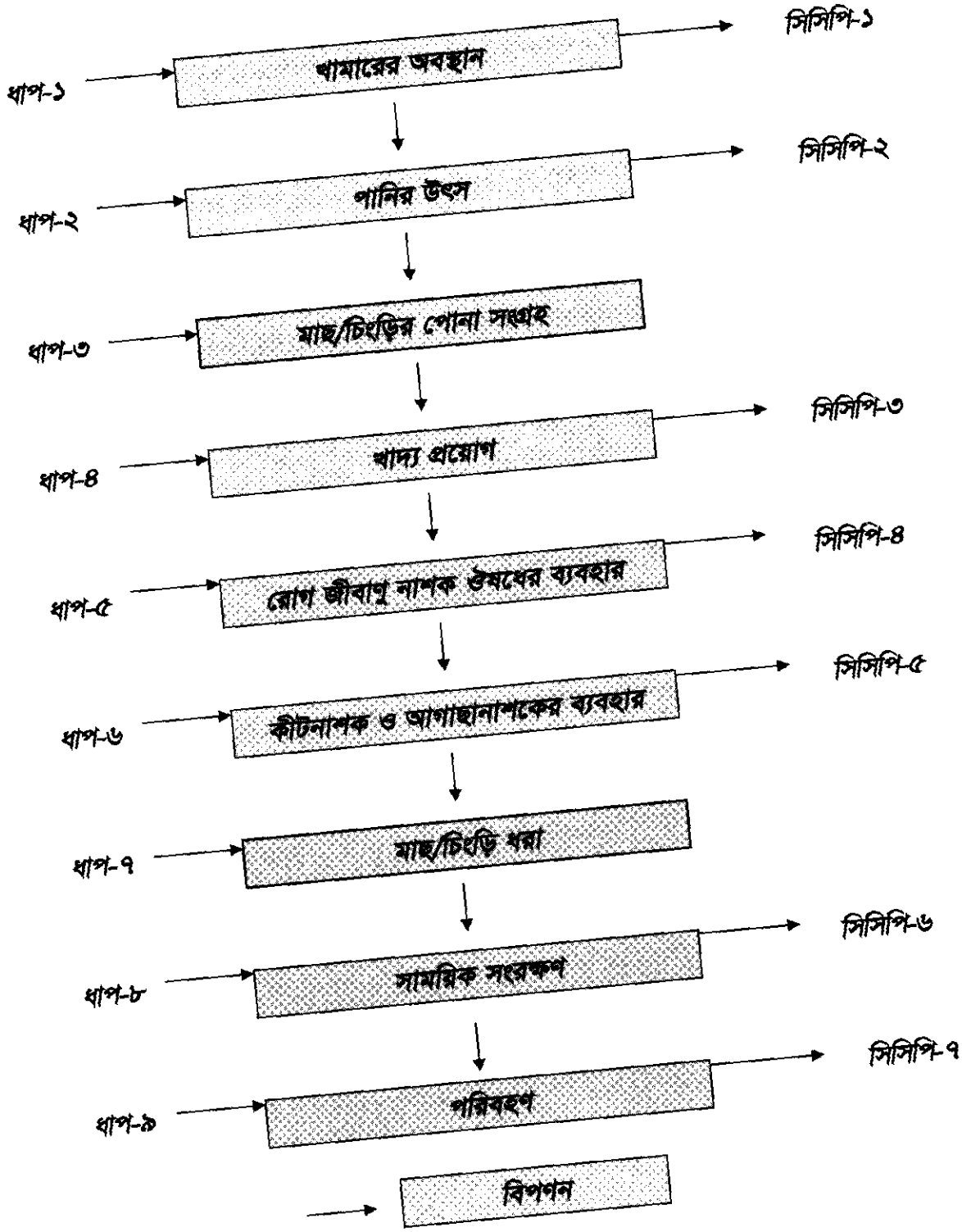

ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট

বি:দ্রঃ উল্লেখিত প্রসেস ফ্লো চার্টটি একটি উদাহরণ মাত্র। কোন একটি নির্দিষ্ট মৎস্য বা চিংড়ি খামারের প্রসেস ফ্লো-চার্ট -এর সংগে এর মিল নাও থাকতে পারে। প্রসেস ফো-চার্ট তৈরীর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বাদ না যায়; কারণ এই ফো-চার্টকে ভিত্তি করেই পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করাা হয়ে থাকে।

মাছ বা চিংড়ি উৎপাদনের একটি নমুনা ফ্লো-চার্ট।

হ্যাজার্ড এনালিসিস্

উৎপাদনের ধাপসমূহ	*সংশিষ্ট হ্যাজার্ডসমূহ*	*প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ*
খামারের অবস্থান	• *রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:* কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ভারী ধাতুসমূহের(পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, ইত্যাদি) দ্বারা দূষণ।	• স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খামার পরিচালনা করা। • মাটি ও পানি পরীক্ষা করা।
	• *জীবকাত হ্যাজার্ডসমূহ:* ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট এবং ভাইরাসের দ্বারা দূষণ।	• স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খামার পরিচালনা করা। • মাটি ও পানি পরীক্ষা করা।
পানির উৎস	• *রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:* কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ভারী ধাতুসমূহের দ্বারা দূষণ।	• স্বাস্থ্যসম্মত উৎসের পানি ব্যবহার করা। • পানি পরীক্ষা করা।
	• *জীবকাত হ্যাজার্ডসমূহ:* ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট এবং ভাইরাসের দ্বারা দূষণ।	• স্বাস্থ্যসম্মত উৎসের পানি ব্যবহার করা। • পানি পরীক্ষা।
মাছ/চিংড়ির পোনা সংগ্রহ	• *জীবকাত হ্যাজার্ডসমূহ:* ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট এবং ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত।	*মাছ ও চিংড়ির পোনা পরীক্ষা*
খাদ্য প্রয়োগ	• *জীবকাত হ্যাজার্ডসমূহ:* ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং মোল্ড-এর দ্বারা দূষণ।	• সঠিক মানের খাদ্য ব্যবহার করা। • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা। • খাদ্যের পরীক্ষা করা।
	• *রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:* এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন এবং কীটনাশক।	• সঠিক মানের খাদ্য ব্যবহার করা। • খাদ্যের পরীক্ষা করা।

রোগ জীবাণু নাশক ঔষধের ব্যবহার	• রোগ জীবাণু নাশক ঔষধের অবশেষ।	• সঠিক মাত্রায় অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা। • ঔষধ প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময় পর মাছ/চিংড়ি ধরা। • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা।
কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার	• কীটনাশক ও আগাছানাশকের অবশেষ।	• সঠিক সময়ে এবং মাত্রায় কেবলমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক ও আগাছা নাশক ব্যবহার করা। • নির্দিষ্ট সময় পর মাছ/চিংড়ি ধরা। • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা।
মাছ/চিংড়ি ধরা	• ***জীবগত হ্যজার্ডসমূহ:*** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি।	মাছ/চিংড়ির ধরার স্বাস্থ্য সম্মত সরঞ্জাম ব্যবহার। ধরার পর রৌদ্রে না রাখা এবং স্বাস্থ্য সম্মত পাত্রে রাখা। শামুক, কাঁকড়া ও ঝিনুক একত্রে না রাখা।

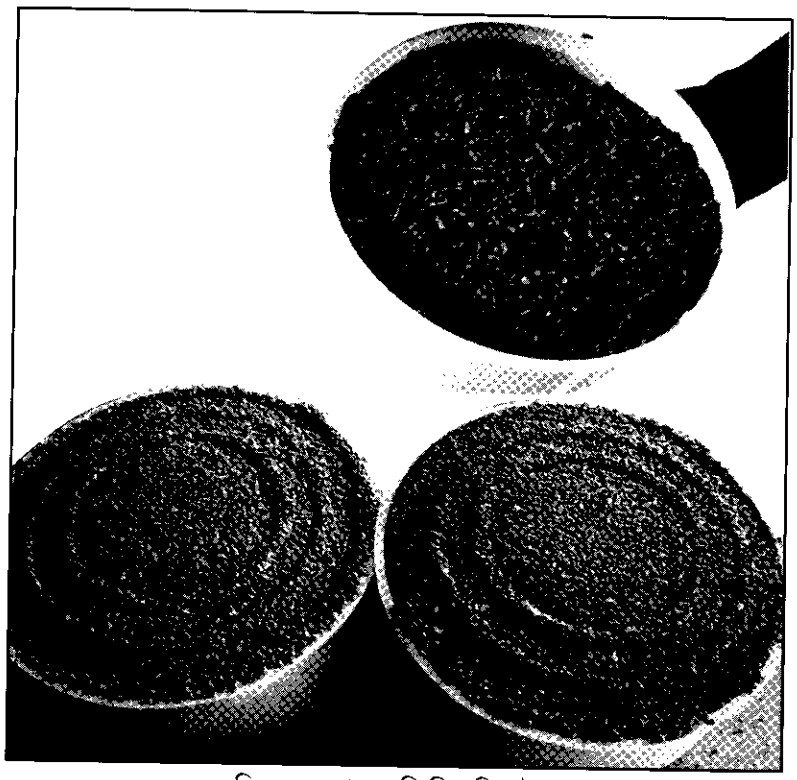

চিত্র ৩৯ ঃ গলদা চিংড়ির পিলেট খাবার

হ্যাজার্ড এনালিসিস্

উৎপাদনের ধাপসমূহ	সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডসমূহ	প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ
■ সাময়িক সংরক্ষণ	■ পদার্থগত হ্যাজার্ডসমূহ: কাঁচ ও লোহার টুকরা, মশা, মাছি বা অন্যান্য পোকা-মাকড়ের দেহের অংশ, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, ইঁদুর ও ছুচোর লোম, মুরগি ও হাঁসের পালকের অংশ, বাঁশের ঝুড়ি ও হোগলা পাতার পাটির ছাচি, পাটের বস্তার আঁশ, বালি, ইত্যাদি।	■ যথাযথ মানের ঘরে ও পাত্রে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ করা।
	■ **রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:** কীটনাশক, আগাছানাশক, ডিটারজেন্ট, কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট দ্বারা আড়-সংক্রমন।	■ সংরক্ষণের স্থানে কীটনাশক, আগাছানাশক, কেরোসিন, পেট্রোল, লুব্রিক্যান্টে ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য না
	■ **জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ:** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দূষণ এবং তাপমাত্রা ও ময়ের নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার কারণে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি।	■ সংরক্ষণের সংগে সংশ্লিষ্ট স্থান, পাত্র ও উপকরণাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। ■ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বরফ পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা।
পরিবহন	■ **পদার্থগত হ্যাজার্ডসমূহ:** বাঁশের ঝুড়ির পঁচা পাতি, হোগলা পাতার পাটির ছাচি, পাটের বস্তার আঁশ, বালি, ইত্যাদির দ্বারা দূষণ।	■ পরিষ্কার ও আবৃত যথাযথ মানের প্লাষ্টিকের পাত্রে মাছ চিংড়ি পরিবহণ করা।
	■ **রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:** কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টে দ্বারা আড়-সংক্রমণ।	■ পরিষ্কার ও আবৃত যথাযথ মানের প্লাষ্টিকের পাত্রে মাছ চিংড়ি পরিবহণ করা।
	■ **জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ:** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দূষণ এবং তাপমাত্রা ও সময়ের নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার কারণে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি।	■ সংরক্ষণের সংগে সংশ্লিষ্ট স্থান, পাত্র ও উপকরণাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা। ■ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বরফ পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা।

হ্যাসাপ প্লান

সিসিপিসমূহ	*হ্যাজার্ডসমূহ*	*প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ*	*ক্রিটিক্যাল লিমিটসমূহ*	*মনিটরিং*	*সংশোধন ব্যবস্থাসমূহ*	*রেকর্ড সংরক্ষণ*
খামারের অবস্থান	• ***রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:*** কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ভারী ধাতুসমূহের দ্বারা দূষণ। • ***জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ:*** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট এবং ভাইরাসের দ্বারা দূষণ।	• স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খামার পরিচালনা করা। • মাটি ও পানি পরীক্ষা করা।	• কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ভারী ধাতুসমূহের উৎসের সংগে খামারের কোন প্রকার সংযোগ থাকবেনা। • ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট এবং ভাইরাসের উৎস, যেমন- মলাধার, বর্জাধার, ইত্যাদির সংগে খামারের কোন প্রকার সংযোগ থাকবেনা। • মাটি ও পানি পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকতে হবে।	• সপ্তাহে ১ বার খামারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিদর্শন করা হবে। • বছরে ১ বার মাটি ও পানি পরীক্ষা করা হবে।	• অস্বাস্থ্যকর উৎসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • পরীক্ষার প্রতিবেদন। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।
পানির উৎস	• ***রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:*** কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ভারী ধাতুসমূহের দ্বারা দূষণ। • ***জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ:*** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট এবং ভাইরাসের দ্বারা দূষণ।	• স্বাস্থ্যসম্মত উৎসের পানি ব্যবহার করা। • পানি পরীক্ষা করা।	• কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ভারী ধাতুসমূহের দ্বারা দূষিত পানি ব্যবহার করা হবেনা। • মল এবং বর্জ দ্বারা দূষিত পানি ব্যবহার করা হবেনা। • পানি পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকতে হবে।	• সপ্তাহে ১ বার পানির উৎস পরিদর্শন করা হবে। • বছরে ১ বার পানি পরীক্ষা করা হবে।	• পানি পরিবর্তন করে নূতন পানি তুলতে হবে।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • পরীক্ষার প্রতিবেদন। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।

হ্যাসাপ প্লান

সিসিপিস মূহ	*হ্যাজার্ডসমূহ*	*প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ*	*ক্রিটিক্যাল লিমিটসমূহ*	*মনিটরিং*	*সংশোধন ব্যবস্থাসমূহ*	*রেকর্ড সংরক্ষণ*
খাদ্য প্রয়োগ	• ***জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ:*** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং মোল্ড- এর দ্বারা দূষণ। • ***রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:*** এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ-হরমোন এবং কীটনাশক।	• সঠিক মানের খাদ্য ব্যবহার করা। • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা। • খাদ্যের পরীক্ষা করা।	• স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত খাদ্যের বেলায় স্বাস্থ্যসম্মত উপকরণ দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে। • বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত খাদ্যের বেলায় "প্রস্তুত খাদ্যে কোন ক্ষতিকর জীবাণু , এন্টিবায়োটিক ও গ্রোথ হরমোন নেই"-এ মর্মে প্রস্তুতকারকের নিকট থেকে সার্টিফিকেট থাকতে হবে। • মোল্ড যুক্ত কোন খাবার ব্যবহার করা হবে না। • খাদ্য পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকতে হবে।	• প্রতি ব্যাচ খাদ্য প্রস্তুতের সময় খাদ্য প্রস্তুত কার্যক্রম পরিদর্শন করতে হবে। • বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত খাদ্যের প্রতিটি ব্যাচের সংগে সার্টিফিকেট আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। • প্রস্তুত খাদ্যের প্রতিটি ব্যাচ থেকে ১ টি নমুনা পরীক্ষা করতে হবে।	• সংশিষ্ট ব্যাচের অবশিষ্ট খাদ্য বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। • ব্যবহৃত ব্রান্ডের পরিবর্তে অন্য কোন ভাল ব্রান্ডের খাদ্য ব্যবহার করতে হবে।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • সার্টিফিকেট। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।
রোগ জীবাণু নাশক ঔষধের ব্যবহার	• রোগ জীবাণু নাশক ঔষধের অবশেষ।	• সঠিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা। • ঔষধ প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময় পর মাছ/চিংড়ি ধরা। • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা।	• ঔষধ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করা হবে। • ঔষধ ব্যবহারের ৪৫ দিন পর মাছ/চিংড়ি ধরা হবে। • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকতে হবে।	• ঔষধ প্রয়োগের সময় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হবে। • মাছ/চিংড়ি ধরার সময় ঔষধ প্রয়োগের সময় থেকে ৪৫ দিন অতিবাহিত হয়েছে কিনা তা যচাই করা হবে। • বছরে ১ টি নমুনা পরীক্ষা করা হবে।	• মাছ/চিংড়ি ধরার সময় আরো পিছিয়ে দিতে হবে।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • মাছ/চিংড়ি ধরার রেকর্ড। • পরীক্ষা প্রতিবেদন। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।

হ্যাসাপ প্লান

সিসিপিসমূহ	*হ্যাজার্ডসমূহ*	*প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ*	*ক্রিটিক্যাল লিমিটসমূহ*	*মনিটরিং*	*সংশোধন ব্যবস্থাসমূহ*	*রেকর্ড সংরক্ষণ*
কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার	• কীটনাশক ও আগাছানাশকের অবশেষ।	• সঠিক সময়ে এবং মাত্রায় কেবলমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক ও আগাছা নাশক ব্যবহার করা। • নির্দিষ্ট সময় পর মাছ/চিংড়ি ধরা। • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা।	• খামারে মাছ/চিংড়ি থাকা অবস্থায় কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার করা হবেনা। • কেবলমাত্র অনুমোদিত তালিকার কীট নাশক ও আগাছানাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করা হবে। • কেবলমাত্র অনুমোদিত সময়ের পর মাছ/চিংড়ি ধরতে হবে। • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকতে হবে।	• কটিনাশক ও আগাছানাশক প্রয়োগের সময় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হবে। • ব্যবহারের সময় কীটনাশক ও আগাছানাশকের তালিকা যাচাই করা হবে। • ব্যবহারের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে কিনা তা যচাই করতে হবে। • বছরে ১ বার পানি ও মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা হবে।	• ক্ষতিগ্রস্থ মাছ/চিংড়ি বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। • মাছ/চিংড়ি ধরার সময় অরো পিছিয়ে দিতে হবে।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • মাছ/চিংড়ি ধরার রেকর্ড। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।

হ্যাসাপ প্লান

সিসিপিসমূহ	*হ্যাজার্ডসমূহ*	*প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ*	*ক্রিটিক্যাল লিমিটসমূহ*	*মনিটরিং*	*সংশোধন ব্যবস্থাসমূহ*	*রেকর্ড সংরক্ষণ*
সাময়িক সংরক্ষণ	• ***পদার্থগত হ্যাজার্ডসমূহ:*** মশা, মাছি বা অন্যান্য পোকা-মাকড়ের দেহের অংশ, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, ইঁদুর ও ছুঁচোর লোম, মুরগি ও হাঁসের পালকের অংশ, বাঁশের ঝুড়ি ও হোগলা পাতার পাটির ছাচি, পাটের বস্তার আঁশ, বালি, ইত্যাদি। • ***রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:*** কীটনাশক, আগাছানাশক, কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টে দ্বারা আড়-সংক্রমন। • ***জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ:*** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দূষণ এবং তাপমাত্রা ও সময়ের নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার কারণে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি।	• যথাযথ মানের ঘরে ও পাত্রে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ করা। • সংরক্ষণের স্থানে কীটনাশক, আগাছানাশক, কেরোসিন, পেট্রোল, লুব্রিক্যান্টে ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য না রাখা। • সংরক্ষণের সংগে সংশিষ্ট স্থান, পাত্র ও উপকরণাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বরফ পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার করা।	• পদার্থগত ও রাসায়নিক হ্যাজার্ড যুক্ত কোন মাছ/চিংড়ি বিক্রয় করা হবেনা। • কেবলমাত্র স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী বরফ ব্যবহার করা হবে। • কেবলমাত্র পাষ্টিকের ঝুড়িতে পর্যাপ্ত বরফসহ মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ করা হবে। • মাছ/চিংড়ির অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সে: এর কম হবে।	• প্রতিটি ব্যাচের মাছ/চিংড়ি দেখে পরীক্ষা করা (Sensory Test) • প্রতিদিন সকালে ও সন্ধার পূর্বে সংরক্ষণের জায়গা পরিদর্শন করা। • ৩ ঘন্টা পর পর মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা পরীক্ষা করা। • ৩ মাস অন্তর বরফ পরীক্ষা করা।	• পদার্থগত হ্যাজার্ড যুক্ত মাছ/চিংড়ি উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলতে হবে। • রাসায়নিক হ্যজার্ড যুক্ত মাছ/চিংড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে। • পুনরায় পর্যাপ্ত বরফ প্রয়োগ করতে হবে।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • পরীক্ষা প্রতিবেদন। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।

হ্যাসাপ প্লান

সিসিপিসমূহ	হ্যাজার্ডসমূহ	প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ	ক্রিটিক্যাল লিমিটসমূহ	মনিটরিং	সংশোধন ব্যবস্থাসমূহ	রেকর্ড সংরক্ষণ
পরিবহণ	• **পদার্থগত হ্যাজার্ডসমূহ:** হোগলা পাতার পাটির ছাচি, পাটের বস্তার আঁশ, বালি, ইত্যাদির দ্বারা দূষণ। • **রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ:** কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টে দ্বারা দূষণ। • **জীবগত হ্যজার্ডসমূহ:** ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দূষণ এবং তাপমাত্রা ও সময়ের নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার কারণে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি।	• পরিষ্কার ও আবৃত যথাযথ মানের পাষ্টিকের ঝুড়িতে মাছ/চিংড়ি পরিবহণ করা। • পরিবহণের সময় মাছ/চিংড়ির কাছা কাছি কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট না রাখা। • সংরক্ষণের সংগে সংশিষ্ট স্থান, পাত্র ও উপকরণাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণূমুক্ত করা। • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বরফ পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার করা।	• পদার্থগত ও রাসায়নিক হ্যাজার্ড যুক্ত কোন মাছ/চিংড়ি পরিবহণ করা হবেনা। • কেবলমাত্র পাষ্টিকের ঝুড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত বরফ সহ মাছ/চিংড়ি পরিবহণ করা হবে। • পরিবহণ যানে কোন প্রকার কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট রাখা যাবেনা। • প্রতিটি পাষ্টিকের ঝুড়ি উত্তরুপে পরিষ্কার থাকবে। • মাছ/চিংড়ির অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেঃ এর কম থাকবে।	• পরিবহণের পূর্বে মাছ/চিংড়ি ও পাত্র দেখে পরীক্ষা করা। • পরিবহণের পূর্বে পরিবহণ যান পরিদর্শন করা। • পরিবহণের পূর্বে প্রতিটি ঝুড়ির মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।	• পদার্থগত হ্যাজার্ড যুক্ত মাছ/চিংড়ি উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলতে হবে। • রাসায়নিক হ্যজার্ড যুক্ত মাছ/চিংড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে। • পুনরায় পর্যাপ্ত বরফ প্রয়োগ।	• পরিদর্শন প্রতিবেদন। • পরীক্ষা প্রতিবেদন। • সংশোধন ব্যবস্থার রেকর্ড।

গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডিউল এবং ম্যানুয়্যাল রচনা পদ্ধতি ও রচনাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পে গলদা চিংড়ি চাষি ও নার্সারি উদ্যোগতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য (ক. গলদা চিংড়ি চাষ, খ. ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ ও গ. গলদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা) তিনটি মডিউল ও ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়। এ সমস্ত মডিউল ও ম্যানুয়াল মাঠ পর্যায়ের গলদা চিংড়ি চাষ এলাকার অভিজ্ঞ কর্মকতাদের তত্ত্বাবধানে তাদের মাধ্যমে রচনা করা হয়। এ জন্য সাভারস্থ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমীতে দুইটি ব্যাচে মোট ৩৭ (সাত্রিশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেণ। এ সমস্ত মডিউল ও ম্যানুয়ালের ফটোকপি করে এবং সফট কপি মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাদের মাঝে চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মডিউল ও ম্যানুয়ালের উপর মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। কর্মকর্তাদের মতামত ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে মডিউল ও ম্যানুয়াল সমূহ সম্পাদনা করা হয় এবং প্রকাশ করা হয়। রচনাকালে সম্পাক্ত কর্মকর্তাগণ দলভিত্তিতে কাজ করেন এবং সাভারস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দের কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে লেখাসমূহ কম্পোজ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।

মডিউল ও ম্যানুয়াল রচনায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী।

ক্রঃ নং	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম	পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
১।	মোঃ মনোয়ার হোসেন	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	ঈশ্বরদী, পাবনা	
২।	এস.এম. রেজাউল করিম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বিরল, দিনাজপুর	
৩।	মোঃ সামছুজ্জামান খাঁন	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	দাগনভূঞা, ফেনী	
৪।	মোঃ রমজান আলী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদর, চুয়াডাঙ্গা	
৫।	শেখ ইয়াকুব আলী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	
৬।	কে.এম. আব্দুল মান্নান	খামার ব্যবস্থাপক	টাঙ্গাইল	
৭।	বিচিত্র কুমার সরকার	খামার ব্যবস্থাপক	মানিকগঞ্জ	
৮।	মোঃ আব্দুদ দাইয়ান	খামার ব্যবস্থাপক	নাটোর	
৯।	মোঃ শাহাজাহান	সহকারী পরিচালক	স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	
১০।	মোহাম্মদ রেজাউল করিম	সহকারী পরিচালক	স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	
১১।	নারায়ন চন্দ্র মন্ডল	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	ফকিরহাট, বাগেরহাট	
১২।	কাজী আবেদ লতিফ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কাউনিয়া, রংপুর	
১৩।	প্রফুল্ল কুমার সরকার	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বটিয়াঘাটা, খুলনা	
১৪।	মুহম্মদ গোলাম মোস্তফা	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	ফুলতলা, খুলনা	
১৫।	হরেন্দ্র নাথ সরকার	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	দাকোপ, খুলনা	
১৬।	কাজী ইকবাল আজম	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	
১৭।	মোঃ মাহবুবুল আলম মিয়া	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	মৎস্য ভবন, ঢাকা	
১৮।	মোঃ জাহিদ হোসেন	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	শ্রীপুর, গাজীপুর	
১৯।	সুভাষ চন্দ্র সাহা	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পীরগঞ্জ, রংপুর	
২০।	অজিত কুমার সাহা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পূর্বধলা, নেত্রকোন	
২১।	এস.এম. এনামুল হক	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদর, নড়াইল	
২২।	মোঃ অলিয়ুর রহমান	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	অভয়নগর, যশোর	
২৩।	মোঃ সিরাজুর রহমান	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	

২৪।	মোঃ এ. জাফর সরকার	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদর, নাটোর	
২৫।	মোঃ আব্দুল অদুদ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদর, সাতক্ষীরা	
২৬।	মোঃ আখতারুজ্জামান	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	
২৭।	মোঃ আখতারুল হক	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদর, মেহেরপুর	
২৮।	মোঃ শামীম হায়দার	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আশাশুনি, সাতক্ষীরা	
২৯।	আবু বকর সিদ্দিক	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	শ্রীপুর, মাগুরা	
৩০।	মোঃ শাহাজাহান মালী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	তেরখাদা, খুলনা	
৩১।	মোঃ মনিরুল ইসলাম	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা	
৩২।	মোঃ মহিউজ্জামান	খামার ব্যবস্থাপক	বোর্ড বাজার, টঙ্গী, গাজীপুর	
৩৩।	দেবব্রত কবিরাজ	খামার ব্যবস্থাপক	সদর, নড়াইল	
৩৪।	মোঃ আবদুল কাইয়ুম	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	
৩৫।	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মোংলা, বাগেরহাট	
৩৬।	চন্দ্র শেখর নন্দী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	ডুমুরিয়া, খুলনা	
৩৭।	মোঃ আবুল হাছানাত	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	

মডিউল ও ম্যানুয়াল রচনা কালে মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমীর পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মডিউল ও ম্যানুয়ালের বিষয় ও রচনার উপর তার মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন এবং জনাব মোঃ আবদুল খালেক, উপপরিচালক মৎস্য অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা ম্যানুয়াল সম্পাদনায় সহায়তা প্রদান করেন।

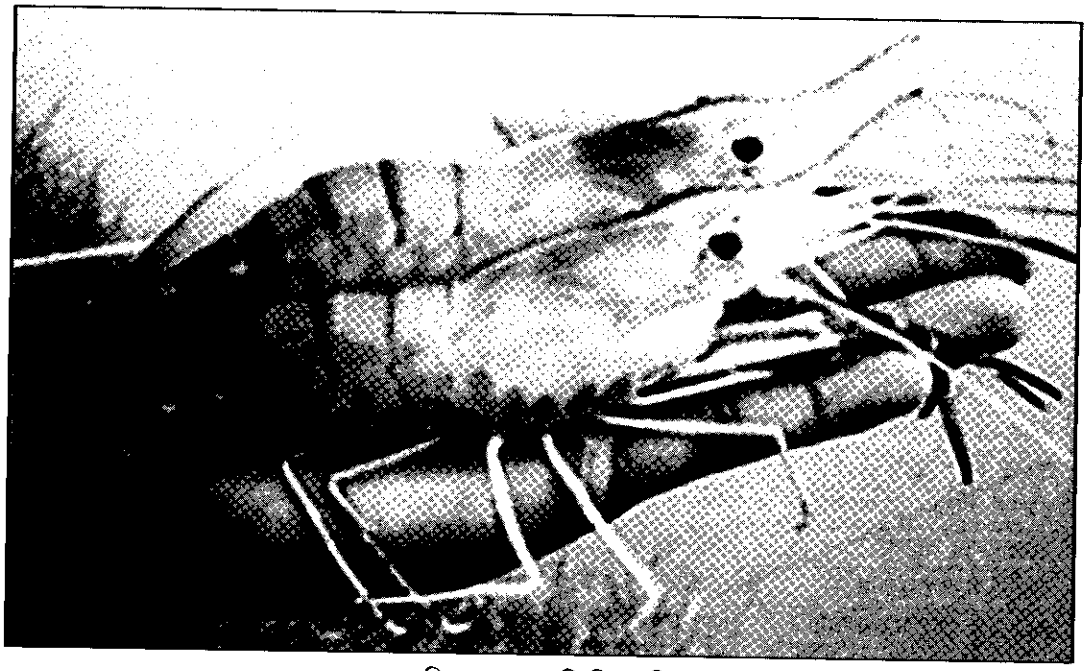

চিত্র ৪০ঃ সুস্থ চিংড়ির ছবি

পরিমাপক ও পরিমাপকের রূপান্তর (Conversions)

দৈর্ঘ্য ঃ

১ মাইক্রোমিটার = ০.০০১ মিঃমিঃ = ০.০০০০০১ মিঃ
১ মিঃমিঃ = ০.০০১মিঃ = ১ ০০০ মাইক্রোমিটার = ০.০৩৯৪ ইঞ্চি
১ সেঃমিঃ = ০.০১ মিঃ = ১০ মিঃমিঃ = ০.৩৯৪ ইঞ্চি
১ মিঃ = ১ ০০০ ০০০ মাইক্রোমিটার = ১ ০০০ মিঃমিঃ = ১০০ সেঃমিঃ = ০.০০১ কিঃমিঃ = ৩৯.৪ ইঞ্চি = ৩.২৮ ফুট = ১.০৯৩ গজ
১ কিঃ মিঃ =১০০০ মিঃ = ১০৯৩ গজ = ০.৬২১ মাইল
১ ইঞ্চি =২৫.৩৮ মিঃ মিঃ = ২.৫৪ সেঃ মিঃ
১ ফুট =১২ ইঞ্চি = ০.৩০৫ মিঃ
১ গজ= ৩ ফুট = ০.৯১৪ মিঃ
১ মাইল= ১৭৬০ গজ = ১.৬০৯ কিঃ মিঃ

ওজন ঃ

১ মাইক্রোগ্রাম= ০.০০১ মিঃ গ্রাঃ = ০.০০০০০১ গ্রাঃ
১ মিঃ গ্রাঃ= ০.০০১ গ্রাঃ = ১ ০০০ মাইক্রোগ্রাম
১ গ্রাম= ১০০০ ০০০ মাইক্রোগ্রাম = ১০০০ মিঃ গ্রাঃ = ০.০০১ কিঃ গ্রাঃ = ০.০৩৫৩ আউন্স
১ কিঃ গ্রাঃ= ১০০০ গ্রাঃ = ২.২০৫ পাউন্ড
১ মেঃ টন= ১০০০ কিঃ গ্রাঃ = ১০০০০০০ গ্রাঃ = ০.৯৮৪২ UK t = ১.১০২ US t
১ আউন্স= ২৮.৩৪৯ গ্রাঃ
১ পাউন্ড= ১৬ আউন্স = ৪৫৩.৫৯ গ্রাঃ
১ UK cwt =১১২ পাউন্ড = ৫০.৮০ কিঃ গ্রাঃ
১ US cwt =১০০ পাউন্ড = ৪৫.৩৬ কিঃ গ্রাঃ
১ UK t =২০ UK cwt = ২২৪০ পাউন্ড
১ US t =২০ US cwt = ২০০০ পাউন্ড
১ UK t= ১.০১৬ মেঃ টন = ১.১২ US t

আয়তন ঃ

১ মাইক্রোলিটার= ০.০০১ মিঃ লিঃ = ০.০০০০০১ লিঃ
১ মিঃ লিঃ= ০.০০১ লিঃ = ১০০০ মাইক্রোলিটার = ১ সিঃ সিঃ
১ লিঃ= ১০০০০০০ মাইক্রোলিটার = ১০০০ মিঃ লিঃ = ০.২২০ UK gallon = ০.২৬৪ US gallon
১ ঘন মিঃ= ১০০০ লিঃ = ৩৫.৩১৫ ঘনফুট = ১.৩০৮ ঘনগজ = ২১৯.৯৭ UK gallons = ২৬৪.১৬ US gallons
১ ঘনফুট =০.০২৮৩২ ঘনমিটার = ৬.২২৯ UK gallons = ২৮.৩১৬ লিঃ
১ UK gallon= ৪.৫৪৬ লিঃ = ১.২০০৯ US gallons
১ US gallon = ৩.৭৮৫ লিঃ= ০.৮৩৩ UK gallon
১ MGD= ৬৯৪.৪৪ GPM = ৩.১৫৭ m3/min = ৩ ১৫৭ L/min

CONCENTRATION - DISSOLVING SOLIDS IN LIQUIDS ঃ

১ %= ১০০ মিঃ লিটারে ১ গ্রাম
১ পিপিটি= ১০০০ মিঃ লিটারে ১ গ্রাঃ= ১ লিটারে ১ গ্রাঃ=১ গ্রাঃ/লিঃ=০.১%
১ পিপিএম= ১০০০০০০ মিঃ লিটারে ১ গ্রাঃ=১ মিঃ গ্রাঃ/লিঃ=১ মাইক্রোগ্রাম/গ্রাঃ
১ পিপিবি= ১০০০০০০০০০ মিঃ লিটারে ১ গ্রাঃ=১০০০০০০ লিটারে ১ গ্রাঃ= ০.০০১ পিপিএম=০.০০১ মিঃ গ্রাঃ/লিঃ

CONCENTRATION - DILUTION OF LIQUIDS IN LIQUIDS ঃ

১ %= ১০০ মিঃ লিটারে ১ মিঃ লিঃ
১ পিপিটি= ১০০০ মিঃ লিটারে ১ মিঃ লিঃ = ১ লিটারে ১ মিঃ লিঃ=১ মিঃ লিঃ/লিঃ= ০.১%
১ পিপিএম = ১০০০০০০ মিঃ লিটারে ১ মিঃ লিঃ=১০০০ লিটারে ১= মিঃ লিঃ=১ মাইক্রোলিটার/লিঃ
১ পিপিবি= ১০০০০০০০০০ মিঃ লিটারে ১ মিঃ লিঃ = ১০০০০০০ লিটারে ১মিঃ লিঃ=০.০০১ পিপিএম=০.০০১ মিঃ লিঃ/লিঃ

ক্ষেত্রফল ঃ

১ বর্গ মিটার=১০.৭৬৪ বর্গফুট= ১.১৯৬ বর্গগজ
১ হেঃ=১০০০০ বর্গমিঃ=১০০ ares = ২.৪৭১ একর
১ বর্গ কিঃ মিঃ=১০০ হেঃ =০.৩৮৬ বর্গমাইল
১ বর্গফুট= ০.০৯২৯ বর্গমিঃ
১ বর্গগজ= ৯ বর্গফুট = ০.৮৩৬ বর্গমিঃ
১ একর= ৪ ৮৪০ বর্গগজ=০.৪০৫ হেঃ
১ বর্গমাইল= ৬৪০ একর = ২.৫৯ বর্গকিলোমিটার

TEMPERATURE (তাপমাত্রা)ঃ

$^{\circ}F = (৯ \div ৫ \times ^{\circ}C) + ৩২$
$^{\circ}C = (^{\circ}F - ৩২) \times ৫ \div ৯$

PRESSURE ঃ

1 psi 70.307 g/cm2

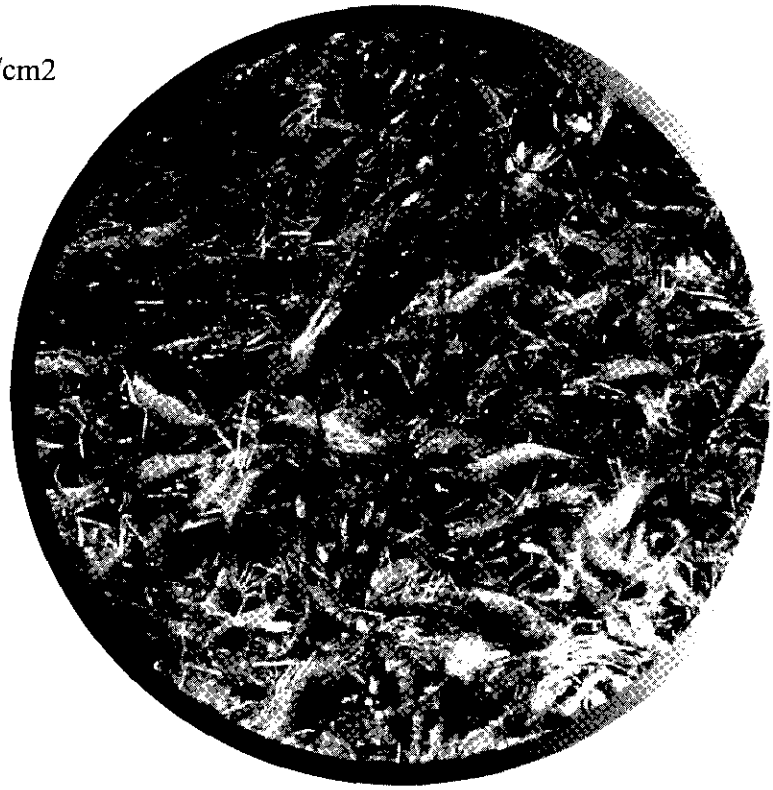

চিত্র ৪১ঃ গলদা চিংড়ি